শিশুতীর্থের পথ



শ্রীউৎপল হোমরায়

শিল্পতীর্থের পথ

শ্রীউৎপল হোম রায়

সাহিত্যায়ন
৮-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

● প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭১।

● প্রকাশক
সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্যায়ন
৮-এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

● মুদ্রাকর
শ্রীসন্তোষ রায়
নিউ টাইপ প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪।

● প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত
৩৬, বকুলবাগান রো, কলিকাতা-২৫।

● ব্লক
শ্রীমুরারী হালদার
হিন্দ হাফটোন কোম্পানী
কলিকাতা-৬।

● পরিবেশক
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

● বাইণ্ডার
ক্লাসিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১/৫, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

● মূল্য
তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আমার পরম পূজনীয় পিতা

স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র হোম রায় মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি।

উৎপল

ভূমিকা

প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীউৎপল হোম রায় শিশুদরদী ও সু-সাহিত্যিক। শিশুকল্যাণ বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানাদির (মণিমেলা, কিশোর-পাঠাগার, শিশু-সঙ্গীত সম্মেলন, শিশু-সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি) সংগঠন এবং পরিচালনায় তাঁর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। বহুদিন যাবতই নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় উৎপলবাবুর লেখা শিশু-বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করার সুযোগ পেয়ে আসছি। আজগুবি ও উদ্ভট গল্প নিয়ে রংচং-এ ছবি আর রঙীন মলাটের বই ছাপিয়ে যাঁরা শিশু-সাহিত্যের বাজারে কায়েম হয়ে বসেছেন উৎপলবাবু আদৌ সে শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যিক নন।

শিশুদের সচিত্র-মাসিক পত্রিকা 'সবুজ কলি'র সম্পাদক রূপেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনায় বাংলা শিশু-সাহিত্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। 'নিখিল ভারত শিশু-সাহিত্য সম্মেলন' নামে সর্বভারতীয় শিশু-সাহিত্যিকদের সংগঠনের পরিচালক ও সংগঠক রূপেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শিশু-সাহিত্যিকদের তিনি কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সূচনার জন্যে।

'শিশুতীর্থের পথ' বাংলা ভাষায় একখানা অভিনব গ্রন্থ। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাক জন্ম অবস্থা থেকে কৈশোর প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত শিশু-জীবনের নানা অবস্থা ও নানা সমস্যার আলোচনা করেছেন উৎপলবাবু তাঁর এই বইটিতে। বারট্রাণ্ড রাসেল কৃত **'On Education'** গ্রন্থখানি পড়ে মনে হয়েছিল যে আমাদের বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর বইয়ের একান্ত অভাব। উৎপলবাবুর 'শিশুতীর্থের পথ' বহুলাংশে সেই অভাব মোচন করবে। এই বই-এ মোট চব্বিশটি প্রবন্ধে শিশু-জন্ম

বৃত্তান্ত, শিশু-পালন, শিশুর খেলাধুলা ও খেয়াল, শিশু-চরিত্রের ক্রম-বিকাশ, শিশুর ভাষা শিক্ষা ও লেখাপড়া, শিশুর স্মৃতি, বুদ্ধি, স্বপ্ন, আভ্যাসিক শিক্ষা, বিকলাঙ্গ-শিশু, শিশু-বিদ্যালয় ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য। বিচিত্র শিশু-লীলার একখানি চমৎকার আলেখ্য।

শিশুর সুষ্ঠু পালন পিতামাতার কর্তব্য, সমাজের দায়িত্ব এবং জাতির দায়। উৎপলবাবুর বইখানা এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমাদের সাহায্য করবে, উদ্বুদ্ধ করবে। বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি। লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

৩রা মে, '৬৪

সমাজ শিক্ষা বিভাগ, — নিখিলরঞ্জন রায়

রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-১

লেখকের নিবেদন

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজ যারা শিশু, ভাবীকালে তারাই রাষ্ট্রের নায়ক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও সমাজের পরিচালক। ভবিষ্যতে কে কেমন হবে—তারই বিপুল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বর্তমান কালের শিশুদের মধ্যে। কবির কথায় বলা যায়ঃ

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা,
সব শিশুদের অন্তরে।'

সুতরাং শিশুর সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক খুব নিবিড় সেই সব মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছোটদের সংগঠনের পরিচালক-পরিচালিকা-দের দায়িত্ব অনেকখানি শিশুর গড়ে ওঠার মূলে। তাঁদেরই উপর নির্ভর করে একটা বিরাট সম্ভাবনার সফলতা আর বিফলতা।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি প্রতিটি উন্নত দেশে মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও শিশু-শিক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর আজ একান্ত প্রয়োজন।

ছোটদের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে উপরের কথাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছি। তাই শিশু-মনোবিজ্ঞানের জটিলতম রহস্যগুলিকে সহজ ভাষায় এখানে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি। এই রচনাগুলি আমার দেশের অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশু ও কিশোর সংগঠকদের কাজে লাগলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

বর্তমান গ্রন্থটিতে যেসব রচনার সমাবেশ ঘটেছে তার সব ক'টিই আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা', যুগান্তর, সবুজের অভিযান প্রভৃতি অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি লেখার সময় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত শিশু-মনোবিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকার দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি এইভাবে একসঙ্গে গ্রথিত করে প্রকাশ করার মূলে রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় ডঃ সুহৃদ চন্দ্র মিত্র, এম, এ, ডি, ফিল (লাইপজিগ) মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রেরণা। তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, এম, এ মহাশয়কে আমার এই পুস্তকের ভূমিকাটি লিখে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই পরম সুহৃদ সু-সাহিত্যিক শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে এই পুস্তকের নামকরণের এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য। আর ধন্যবাদ জানাই 'সাধনা' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসন্তোষ রায় মহাশয়কে' শিশুতীর্থের পথ' এর প্রুফ সযত্নে দেখে দেওয়ার জন্য—এই ব্যাপারে সব কৃতিত্বই তাঁর পাওনা। সুহৃদ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ দত্তের প্রচ্ছদপট এই পুস্তকের মর্যাদা বাড়িয়েছে। তাঁকেও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই ভ্রাতৃসম শ্রীজ্যোতির্ময় সেন মহাশয়কে—কারণ তাঁর উৎসাহ এর পেছনে না থাকলে হয়তো পুস্তকটি প্রকাশ করাই সম্ভব হতো না। শিশু-মাসিক পত্র 'সবুজকলি'র কর্মাধ্যক্ষ কয়েকটি ব্লক দিয়ে এই পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। তাঁকে ও তুজন শিশু-শিল্পীকে এবং আলোকচিত্র শিল্পী শ্রীসুনীল কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কেও এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ডাক্তার আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র হোম রায় মহাশয়ের নামটি উল্লেখ করছি। তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রেরণাই আমার প্রতিটি লেখার মূলে রয়েছে, এ কথাটিকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দিতেই আমার এই পুস্তকটি তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। জয়হিন্দ্ !

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭১
কলিকাতা।

সূচীপত্র

শিশুতীর্থের পথ



জাতির ভবিষ্যৎ

শিল্পী : শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত

শিশুতীর্থের পথ

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান . . . .

একদিন আমাদের এই বাংলা দেশের কবির কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে—

'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।'

ভাবী মায়ের পক্ষে একথাটি যে কত সত্য—তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কথায় বলে দশ মাস দশ দিন নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মায়ের কোলে যখন শিশু আসে—তখন মায়ের আনন্দ আর ধরে না। এই দুঃসহ ব্যথার মধ্যেই নিহিত থাকে অফুরন্ত পুলক, ভয়, আশা ও আনন্দ। প্রত্যেক মেয়ের মনেই 'মা' হওয়ার গোপন ইচ্ছাটি বর্তমান। একটি মেয়ে যখনই জানতে পারে যে সে 'মা' হতে চলেছে তখনই তার মন আনন্দ ও গর্বে ভরে ওঠে। সেদিনকার সেই সুখ-মুহূর্তের কল্পনাটি সব দেশের মায়ের মনেই লুকনো থাকে।

ভাবী মায়ের মন কল্পনায় বিভোর হয় শিশুর আগমন বার্তার প্রথম দিনটি থেকেই। কল্পনায় সে ভাবী শিশুর সঙ্গে কথা কয়, খাওয়ায়, পরায় আদর করে। তখন তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খার মূল হয়ে দাঁড়ায় তার ভাবী শিশুটি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই স্বর্গীয় দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয় ক'জন মা? এর প্রধান কারণ হলো—অজ্ঞতা।

প্রথম মাতৃত্বের সময় কোনও মেয়েরই অভিজ্ঞতা বলে কোনও জিনিস থাকে না। দেহও মনের নতুন নতুন লক্ষণ দেখে তারা ভয় পায়। তাই অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে তখন উপদেশ নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। ভালো ভালো বই পড়া, সকাল-বিকেল সমান জায়গায় খোলা আলো-হাওয়ার মধ্যে বেড়ানোর অভ্যাস করা তখন একান্তভাবেই প্রয়োজন। ভালো কথা ও ভালো আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনগুলি অতিবাহিত করার চেষ্টা করাই হলো ভাবী মায়ের পক্ষে তখন বিশেষ প্রয়োজন। মায়ের অস্থি ও মজ্জা দিয়েই শিশুর সৃষ্টি। মায়ের নাড়ীর যোগেই হলো শিশুর স্বাস্থ্য। তাই ভাবী মায়ের এই সাবধানতা।

মা ও বাবার জীবকোষের মিলনের ফলেই প্রাণের সঞ্চার হয়। আর এই প্রাণের সঞ্চার থেকেই ভ্রূণের প্রাণ-স্পন্দনের সৃষ্টি। এই মুহূর্তে ভাবী শিশু অনুবীক্ষণের দৃশ্য বস্তু। আবার ন' মাস পরে এই বিন্দুই হলো একটি পূর্ণ শিশু। গর্ভকালের শেষ ভাগে ভ্রূণটি বড় হয়ে ওঠে। তখন সে মায়ের গর্ভের বাইরে চলে আসতে চেষ্টা করে ও মাতৃগর্ভ চায় তাকে ধরে রাখতে। তখন সে যে পূর্ণ মানুষ! আর কী সে চায় মাতৃগর্ভের অন্ধকারে কাল কাটাতে? এর ফলে মায়ের শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। তাইতো কবি বলেছেন ঃ 'মা হওয়া কি মুখের কথা……।'

বিধাতা পুরুষের খেলাঘরে ভ্রূণটির যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে তা হলো ঃ

(ক) শেষ মাসিকের দ্বিতীয় সপ্তাহে—মা ও বাবার জীবকোষের মিলনের ফলে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা প্রাণ পায় দ্বিতীয় সপ্তাহে।

(খ) তৃতীয় থেকে পঞ্চম সপ্তাহে—ভ্রূণটি ক্রমে গর্ভস্থানের দিকে এগিয়ে চলে। পঞ্চম সপ্তাহের শেষ ভাগে ধূসর ও সাদা রং এর মাংস পিণ্ড রূপে দেখা দেয়।

(গ) ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম সপ্তাহে—ভ্রূণের শেষ দিকে ল্যাজের মতো দেখা দেয়। হাত ও পা দেখা দিতে শুরু করে। চামড়ার নীচে একটু একটু করে চোখের চিহ্ন দেখা দেয়। ৮ মাসের শেষ ভাগে মুখাবয়ব ও মনুষ্যাকৃতি চেহারার গঠন শুরু হয়। ৯ম সপ্তাহে হাত-পা ও মাথার গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে। এই সময় থেকেই ক্ষুদ্রাকৃতি ভ্রূণটি মানুষের আকার নেয়।

(ঘ) তৃতীয় মাসের শেষ ভাগে—হাত-পা, আঙুল, গোড়ালী ও মাথার গঠন সম্পূর্ণ হয়। পায়ে ও হাতে নখের চিহ্ন দেখা দেয়। পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গের পার্থক্য দেখা দেয়। মাথাটি শরীরের তুলনায় অনেক বেশী বড় দেখায়। তিন ইঞ্চি লম্বা ও এক আউন্স অর্থাৎ তিরিশ গ্রাম ওজনের হয় ভ্রূণটি।

(ঙ) চতুর্থ মাসের শেষে—ভ্রূণের হৃদয় স্পন্দন শুরু হয়। খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম দেখা দেয় সমস্ত শরীরে। চোখে পাতি ও ভ্রূ দেখা দেয়। লম্বায় হয় ৮½ ইঞ্চি ও ওজন দাঁড়ায় ১৮০ গ্রাম।

(চ) পঞ্চম মাসের শেষে—মাথায় চুল দেখা দেয়। চামড়ার নীচে চর্বি জমা হতে থাকে। এই সময় জন্ম হলে—কয়েক মিনিট মাত্র বেঁচে থাকে। ১২ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয় ও ওজন দাঁড়ায় এক পাউণ্ড।

(ছ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসের শেষে—মাথায় বেশ ঘন চুল দেখা দেয়। চোখের পাতা খোলা থাকে। ৭ম মাসের শেষে জন্মালে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। আমাদের দেশের একটি প্রবাদ হলো—৭ম মাসের শেষে যে শিশু জন্ম নেয়—সে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী হয়। লম্বায় হয় প্রায় ১৬ ইঞ্চি ও ওজনে তিন পাউণ্ড দু' আউন্সের মতো।

(জ) ৮ম্ ও ৯ম মাসের শেষে—৮ম মাসের শেষে শিশু ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৫½ পাউণ্ড ওজনের হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে

৯ম মাসের শেষেই হলো শিশু জন্মানোর পূর্ণ মাস। এই সময় গায়ের চামড়া দেখতে মসৃণ হয়। মাথায় প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা চুল দেখা দেয়। হাত ও পায়ের নখ বেশ বড় হয়। প্রায় কুড়ি ইঞ্চি লম্বা ও ওজনে ৬ থেকে ৭ পাউণ্ডের মধ্যে হয়।

ভাবী মাকে তার সুস্থ মনের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরও যাতে সুস্থ ও সবল থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রত্যেক ভাবী মাকে মনে রাখতে হয় যে কোন ক্রমেই যেন তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম না করেন ও গুরুপাক দ্রব্য আহারের সঙ্গে গ্রহণ না করেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের যত্ন নিতে হয় প্রত্যেক ভাবী মাকে। তার কারণ মায়ের বিষাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর দাঁত—ভাবী শিশুর অনিষ্ট ঘটায়। এই সময়ে ঢিলে-ঢালা কাপড় ও জামা পরা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে যত্ন নিতে হয় প্রত্যেক ভাবী মাকেই।

নীচের তালিকা মতো আহারের নির্দেশ দিয়ে থাকেন আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা—

দুধ—প্রত্যেক দিন একসের থেকে দেড়সের পর্যন্ত। এছাড়া বাড়তি ফুডের ব্যবস্থা থাকলে ভালো।

মাছ ও মাংস—মাত্র একবার রাত্রি অথবা দুপুরের আহারের সঙ্গে। পরিমাণ সম্বন্ধে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ফল—কলা, কমলালেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, ডাবের জল ও বেদানা প্রভৃতি। যেকোনও দু'টি ফলের ব্যবস্থা প্রাত্যহিক আহারের তালিকায় থাকা প্রয়োজন।

শাকসব্জি—দুপুর ও রাত্রির আহারের সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

ডিম—সম্ভাব্যস্থলে মাত্র একবার। তাও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করাই ভালো।

ভাত ও রুটি—দুপুরের আহারের তালিকায় ভাত ও রাত্রির আহারের তালিকায় ভালো গমের আটার রুটি।

ভাবী মায়ের খাদ্যের তালিকায় যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ—এটা মনে রাখতেই হবে যে ভাবী মায়ের সুস্থ মন ও সুস্থ শরীর থেকেই তার ভাবী শিশু সুস্থ মন ও সুস্থ-দেহের অধিকারী হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে একটা বিশেষ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বীর অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু মাতৃগর্ভ থেকেই অস্ত্রবিদ্যা ও ব্যূহ রচনার অপূর্ব কলা-কৌশলের শিক্ষা পেয়েছিলেন। আজকের মনোবিজ্ঞানীরাও বলেন—'গর্ভ অবস্থায় মনের আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা তার ভাবী শিশুকে প্রভাবান্বিত করে থাকে।' তাই গর্ভকালীন পরিবেশের প্রতি মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন।

সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎ চিন্তা ইত্যাদি ভাবী মায়ের মনকে একটি সুচিন্তিত ভাবধারার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মায়ের মনের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীকরূপে ভাবী শিশুর আত্মপ্রকাশ যাতে হতে পারে সেদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হয়—তাঁদেরও—যাঁরা তখন সেই ভাবী মায়ের আশে পাশে অবস্থান করেন। মহৎ জীবনকে পেতে হলে ভাবী মায়ের পরিবেশ মহত্তর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তবেই না দুঃসহ ব্যথার অবসান ঘটিয়ে বিশাল প্রাণের সৃষ্টির সূচনা দেখা যাবে। আবার দেখা দেবে বিগত যুগের মতো আমাদের ঘরে ঘরে বিভিন্নমুখী প্রতিভার। জন্ম হবে মুক্ত পুরুষ, বীর আর মনীষীদের!

শিশু পালনের সাধারণ কথা

জন্মানোর পর থেকে যদি শিশুকে একটি সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়—তবে খুবই সুফল পাওয়া যায়। যে বিষয়গুলির উপর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য রাখতে বলে থাকেন, তা হলো : শিশুর খাওয়া, স্নান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ঘুম। তাঁরা শিশুর প্রাত্যহিক কর্মসূচীকে এই ভাবে অনুসরণ করতে বলেন অন্ততঃ ছ'মাস বয়েস পর্যন্ত :

ভোর ৫টায়	—	শিশুর হাত-মুখ ধোয়ানো ও শিশুর নিম্নভাগ পরিষ্কার করা। জামা-কাপড় পাল্টানো ও কাজল পরানো।
ভোর ৫-৩০ মিঃ	—	মায়ের দুধ খাওয়ানো ও শিশু যাতে হাত-পা নেড়ে খেলতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
সকাল ৬-৩০ মিঃ	—	ছাগল অথবা গরুর দুধ খাওয়ানো, দোলনাতে শোয়ানো, খেলা ও ঘুম।
সকাল ৯-৩০ মিঃ	—	স্নান, অন্য যে কোনও একটি বাড়তি খাদ্য খাওয়ানো ও কোলে তুলে ঘুম পাড়ানো।
দুপুর ১২-৩০ মিঃ	—	ছাগল অথবা গরুর দুধ খাওয়ানো ও ঘুম।
বিকেল ৩-৩০ মিঃ	—	অন্য যে কোনও একটি বাড়তি খাদ্য খাওয়ানো ও ঘুম।

বিকেল ৫-৩০ মিঃ — পোশাক পাল্টানো, মুখ ধোয়ানো, কাজল পরানো, একটু খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা না লাগে এমন ভাবে জামা-কাপড় পরিয়ে নিয়ে বেড়ানো।

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ — মায়ের দুধ খাওয়ানো ও ঘুম।

রাত্রি ১০টায় — গরুর দুধ খাওয়ানো ও ঘুম।

দিনের বেলায় শিশুর ঘুমনোর ব্যবস্থা যত বাইরে রোদ্দুরের মধ্যে করা যায় ততই মঙ্গল। তবে সমস্ত সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিশুর মাথায় রোদ্দুর না লাগে। বাইরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করলে শিশুকে মশারী দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে—যাতে মাছি, মশা বা অন্য কোনও পোকা-মাকড় বিরক্ত করতে না পারে। চার মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে সকাল ৯-৩০ মিঃ এর খাওয়ার সঙ্গে একটু একটু ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে মাঝে মাঝে শিশুকে বাড়তি খাদ্য হিসেবে মিছরির জল দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা শিশুদের খাদ্য তালিকাতে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে দিনে অন্ততঃ পক্ষে দু'তিনবার বাড়তি খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

শিশুদের স্নানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মুখের ভেতরটিও যাতে পরিষ্কার থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মধু অথবা ব্লু-পেইন্ট তুলোতে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখের ভেতরটি পরিস্কার করে দিতে হয়। শিশুর স্নানের ব্যবস্থা ঠাণ্ডা ও গরম জল মিশিয়ে করলে ভালো হয়। ভালো করে তেল মাখিয়ে নিয়ে নরম তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে শিশুর বুক, পিঠ ও হাত-পা মুছিয়ে দিতে হবে। তুলো জলে ভিজিয়ে নিয়ে খুব সাবধানে শিশুদের চোখ ও নাক পারষ্কার করে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। স্নানের পর তাড়াতাড়ি পোশাক পরাতে হবে ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুর খাওয়ার মাঝে মাঝে ফুটনো জল খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

অসময়ে কান্নাকাটি জুড়লে গ্রাইপ ওয়াটার বা গ্রাইপ মিকস্চার খাওয়ানোর পরামর্শ চিকিৎসকরা দিয়ে থাকেন। প্রাত্যহিক না হলেও সাপ্তাহিক কর্মসূচী হিসেবে শিশুকে একবার ওজন করানো বিধেয়। কারণ এই ওজন কমা ও বাড়ার মধ্যেই শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, না খারাপ হচ্ছে—তা বুঝতে পারা যায়।

সাধারণতঃ এক সপ্তাহ বয়স থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ওজন যা হওয়া উচিত—তা হলো ঃ

জন্মানোর সময় সাধারণতঃ ওজন হয়—৬ পাঃ ৪ আঃ
এক সপ্তাহ বয়সে „ „ „ —৬ পাউণ্ড
দু' „ „ „ „ „ —৬ পাঃ ৮ আঃ
তিন „ „ „ „ „ —৬ পাঃ ১৪ আঃ
চার সপ্তাহ অর্থাৎ এক মাস বয়সে ওজন হয়—৭ পাঃ ৪ আঃ
দুই মাস বয়সে সাধারণতঃ ওজন হয়—৮ পাঃ ১২ আঃ
তিন „ „ „ „ „ —১০ পাঃ ৪ আঃ
চার „ „ „ „ „ —১১ পাঃ ১২ আঃ
পাঁচ „ „ „ „ „ —১৩ পাঃ ৪ আঃ
ছয় „ „ „ „ „ —১৪ পাঃ ৪ আঃ
সাত „ „ „ „ „ —১৫ পাঃ ৪ আঃ
আট „ „ „ „ „ —১৬ পাঃ ৪ আঃ
নয় „ „ „ „ „ —১৭ পাঃ ৪ আঃ
দশ „ „ „ „ „ —১৮ পাঃ ৪ আঃ
এগার „ „ „ „ „ —১৯ পাউণ্ড

বারো মাস অর্থাৎ এক বছর বয়সে সাধারণতঃ ওজন হয়—২০ পাউণ্ড

যে কথা ক'টি শিশু পালনের অতি সাধারণ কথা হলেও মায়েদের একান্তভাবে মনে রাখতে হয় তা হলো ঃ

(ক) শিশুর ঠাণ্ডা লাগা—শিশুকে সমস্ত সময়েই ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চট করে ছোটদের ঠাণ্ডা লেগে যেতে

পারে। অবশ্য ঠাণ্ডার ভয়ে শিশুর গায়ে আলো-হাওয়া লাগানো যাবে না—সে কথাটাও ঠিক নয়। বরং ভালো কাপড়-জামা পরিয়ে নিয়ে রোজ অন্ততঃ একবার খোলা জায়গায় বেড়াতে হবে।

(খ) পায়খানা না হওয়া—কষার ধাতটি প্রায় সময়ই শিশুর জন্মগত অধিকারে দাঁড়ায়। খাদ্য তালিকায় জলীয় পদার্থের অভাবেই শিশুর এই কষা ধাত দেখা দেয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফোটানো জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা ও আস্তে আস্তে শিশুর তলপেটটি সরষের তেল দিয়ে মালিশ করে দেওয়া বিধেয়। এই সময়ে ফলের রস এই কষা ধাতটিকে দূর করতে সহায়ক হয়ে থাকে।

(গ) পেট খারাপ হওয়া—অনেক সময় খাওয়া হজম না হলে কিংবা বেশী খাওয়া হলে শিশুরা পাতলা জলের মতো পায়খানা করে থাকে। এতে বিশেষ ভয়ের কারণ আছে। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) বমি হওয়া—শিশু তার খাওয়ার পরই খানিকটা খাদ্য বার করে দেয় বমির সাহায্যে। এ ছাড়া বেশী বমির উদ্রেক দেখা দিলে খাওয়ার সময়ের দীর্ঘতা বাড়াতে হয়। টক অথবা ছানা বমি করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) শরীরের ঘা—সাধারণতঃ ময়লা জমে থাকার দরুন অথবা পেচ্ছাব-পায়খানার সঙ্গে এ্যাসিড জাতীয় পদার্থ নির্গত হওয়ার ফলে অনেক সময় শিশুর নিম্নভাগে ঘায়ের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ঘায়ে ক্যাস্টর অয়েল অয়েণ্টমেণ্ট অথবা ঐ জাতীয় অয়েণ্টমেণ্ট দিলে ভালো হয়।

(চ) দাঁত ওঠার সময়—বেশীর ভাগ শিশুই প্রথম দাঁত ওঠার সময় বিশেষ কষ্ট পায়। জ্বর, পেট খারাপ ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় এই দাঁত ওঠার সময়। এই সময় শিশুকে 'বোন রিং'

ব্যবহার করতে দিতে হয়। যদি দাঁতের গোড়ায় খুব যন্ত্রণা দেখা দেয় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

স্বাভাবিক উপায়ে শিশু বড় হয়ে উঠছে কিনা এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে নীচের প্রশ্ন ক'টির উত্তর পাওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঃ

১। প্রত্যেক সপ্তাহে কি শিশুটির ওজন নেওয়া হয়?
২। শিশুর চামড়া ও মুখশ্রী কি উজ্জ্বলতর হচ্ছে?
৩। শিশুর চোখ কি উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে?
৪। শিশু কি তার খাওয়া উপভোগ করতে পারে ও খিদের উদ্রেক হলে ছটফট করে?
৫। শিশু কি শান্তভাবে নিদ্রা যায়?
৬। শিশু কি স্বাভাবিক উপায়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে?
৭। ঠিক সময়ে কি দাঁত দেখা দিয়েছে?
৮। শিশু কি তার আশপাশের ঘটনার দিকে মন দিতে পারছে?
৯। লোক চিন্‌তে পারছে কি?
১০। রং অথবা জিনিসের পরিবর্তন বুঝতে শিখছে কি?

প্রত্যেক শিশুরই জন্মের পর থেকে নীচের তালিকা অনুযায়ী ওজনের তালিকা রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তালিকাটি এইভাবে তৈরী করলে খুব ভালো ফল দেখা দেয় ঃ

শিশুর নাম.......................................

অভিভাবকের নাম.................................

ঠিকানা..

জন্ম সময়...................................... সকাল/রাত্রি

জন্ম তারিখ......................................

বয়স	ওজন	
	পাউণ্ড	আউন্স
জন্মের সময় ওজন		
এক সপ্তাহ বয়সে ওজন		
দু' ” ” ”		
তিন ” ” ”		
এক মাস ” ”		
দু' ” ” ”		
তিন ” ” ”		
চার ” ” ”		
পাঁচ ” ” ”		
ছ' ” ” ”		
সাত ” ” ”		
আট ” ” ”		
ন' ” ” ”		
দশ ” ” ”		
এগার ” ” ”		
এক বছর ” ”		

শিশুর ক্রম বিকাশের একটি তালিকা প্রস্তুতের জন্য নীচের শিশু নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আজকের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই নির্দেশিকা থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যও পাওয়া যেতে পারে। শিশু—নির্দেশিকাটি এইভাবে প্রস্তুত করতে হয়ঃ

শিশুর নাম...

জন্ম দিন..................সময়..................................সকাল / রাত্রি

জন্মস্থান..

মায়ের নাম..

পিতার নাম..

জন্ম সময়ে উপস্থিত চিকিৎসকের নাম..............................

ঠিকানা..

প্রথম হাসি যে দিন দেখা দিল..................................

প্রথম দাঁত যেদিন উঠতে শুরু করল..............................

প্রথম কথাটি যেদিন বল্‌তে শুরু করল..........................

প্রথম উবু হতে যেদিন শুরু করল................................

প্রথম হামা দিতে যেদিন শুরু করল..............................

যেদিন প্রথম একলা বসতে শিখল..................................

যেদিন প্রথম নিজে দাঁড়াতে শিখল................................

যেদিন প্রথম হাঁটতে শিখল..

এছাড়া বিশেষ কোনও চিত্তাকর্ষক বিষয় যদি থাকে..............

....

....

....

যিনি নির্দেশিকাটি তৈরী করেছেন

তাঁর স্বাক্ষর ও তারিখ।

মনোবিজ্ঞানীরা যে ক'টি নিয়ম বিশেষভাবে নতুন মা-টিকে মানতে বলেছেন—তা হলো ঃ

(ক) শিশু কাঁদছে বলে মা কখনই তাকে তাঁর শয্যার পাশে তুলে নেবেন না।

(খ) শিশুর চোখে বা মুখে কখনই জোরালো আলো ফেলবেন না।

(গ) রাত্রি দশটার পর শিশু ঘুম থেকে জাগলো বলে কখনই আবার খাওয়াতে বসবেন না।

(ঘ) ভিজে কাঁথায় কখনই শিশুকে শুইয়ে রাখবেন না।

(ঙ) শিশুকে সেদ্ধ করা ফোটানো জল খাওয়াতে কখনই ভুলবেন না।

(চ) শিশুকে মুখ লাগিয়ে কখনই চুমু খাবেন না।

(ছ) শিশুর গায়ে বা মুখে কখনই মশা, মাছি অথবা পোকা বস্‌তে দেবেন না।

(জ) বেশা খাদ্য অথবা পুতুল দিয়ে শিশুর কান্না থামাতে কখনই চেষ্টা করবেন না।

(ঝ) শিশুর মুখের ভেতরটি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখন পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবেন না।

(ঞ) শিশুকে শান্ত করার জন্য অযথা ঝাঁকুনি অথবা দোলানি দেবেন না।

(ট) শিশুকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনই জোলাপ জাতীয় কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করবেন না।

(ঠ) শিশুকে মুখে দুধের বোতল নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেবেন না।

(ড) শিশুকে কখনই মুখে ঢাকা দিয়ে ঘুমুতে দেবেন না।

(ঢ) শিশুকে কখনই গরম অথবা স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়ায় নিয়ে যাবেন না।

(ন) শিশুর কান্না না থামিয়ে অথবা কান্নার কারণটি না জেনে কখনই নিজে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হবেন না।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক শিশুই এক বছর বয়স পর্যন্ত যখন তখন নিজের হাতের আঙ্গুল নিয়ে চুষতে আরম্ভ করে। শিশুর যখন খিদে পায় তখন মায়ের স্তনের দুধে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। আবার অন্য সময় বোতল-দুধ সে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকে। এই চুষে খাওয়ার ফলে তার ঠোঁট দু'টিতে এক প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আবার এই উত্তেজনা শিশুকে বিশেষ আনন্দও দেয়। এই ইচ্ছার ফলেই শিশু আঙ্গুল চোষায় অভ্যস্ত হয়। বিখ্যাত যৌন বিজ্ঞানী ফ্রয়েড শিশুর এই আঙ্গুল চোষার ইচ্ছেটিকে তার কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্যাভলভ ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা শিশুর এই ইচ্ছেটিকে অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তির পর্যায়ে ফেলেছেন।

শিশুর খাদ্য ব্যবস্থা

শিশুর জন্মের পরে—মায়ের দুধ-ই তার পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। মায়ের স্তনের দুধ একদিকে যেমন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ, অন্যদিকে তেমনই নিরাপদ। এই জন্যই শিশু জন্মের পর মায়ের দেখা উচিত, যাতে নিজের স্বাস্থ্য সুস্থ এবং পরিপুষ্ট থাকতে পারে। সাধারণভাবে শিশুকে ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর দিনে প্রায় ৫-৬ বার দুধ খাওয়ানো চল্‌তে পারে। রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় শিশুকে জোর করে দুধ না খাওয়ানোই যুক্তিযুক্ত। কারণ এতে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। শিশুর খাদ্য-ব্যবস্থা সমস্ত সময়েই রুটিন মতো হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক সপ্তাহেই অন্ততঃ একবার শিশুর ওজন নেওয়া উচিত।

শিশুর খাওয়ার বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য যাতে থাকে তার চেষ্টা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিশুর জীবনের এই সময়কার প্রতিটি মুহূর্ত বিশেষ অর্থপূর্ণ। সুতরাং শিশুর খাওয়া, বিশ্রাম এবং নিদ্রা প্রতিটি বিষয় কঠিন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে করতে পারলেই, সুস্থ শিশুর মধ্যে সুস্থ মনের ছাপ পড়া সম্ভব।

জন্মগ্রহণের পর প্রথম ৬ মাস থেকে ৯ মাস পর্যন্ত—শিশুর প্রধান খাদ্য হলো মায়ের স্তনের দুধ। অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যও শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। আস্তে আস্তে মায়ের দুধ বন্ধ করে দিয়ে শিশুকে অন্যান্য খাদ্যে অভ্যাস করাতে হয়। নতুবা আকস্মিক পরিবর্তনে শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

শিশুদের মধ্য 'রিকেট' রোগের অনেক সময় আধিক্য দেখা যায়। ঐ

'রিকেট' রোগ কড্‌লিভার অয়েলের সাহায্যে প্রতিরোধ করা যায়। এই কড্‌লিভার অয়েলকেই মায়ের দুধের বদলী খাদ্য হিসাবে প্রথম ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয় মাস থেকে শিশুকে এক চামচ করে কমলা লেবুর রস দেওয়া চলে। এর পরে ৪।৫ মাস বয়সে সব্জি ও ডিম, বহুল শস্যজাত খাদ্য-দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য হিসাবে শিশুকে ধীরে ধীরে অভ্যাস করানো যেতে পারে। অনেক সময় মা অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরিপূরক খাদ্য হিসেবে গরুর দুধে পরিমিত জল মিশিয়ে ভালোভাবে ফোটানোর পর শিশুকে খাওয়ানো চলতে পারে। কারণ গরুর দুধে অনেক দূষিত পদার্থ থাকে—যার প্রভাবে শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। প্রত্যেক দিন শিশুকে ফুটানো জল ঠাণ্ডা করে নিয়ে বেশ কিছু পরিমাণে খাওয়াতে হয়।

পরিমিত খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে যেমন শিশু শৈশব থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিমিত আহারও মানব-শিশুকে সুস্থ এবং সবল করে গড়ে তোলে। স্বাস্থ্য রক্ষার এক বিশেষ দিক হচ্ছে পরিমিত আহার।

বিভিন্ন বয়স, প্রকৃত-গত বৈষম্য ও শ্রমের মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী আদর্শ খাদ্য ও খাদ্য-উপাদানগুলির প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য করে নিয়েই খাদ্য-ব্যবস্থা করতে হয়। প্রধাণতঃ জানতে হয়, কোন্ খাদ্যে কতটুকু শক্তি বা 'খাদ্যপ্রাণ' আছে। দ্বিতীয়তঃ জানতে হয়—আগুনে সিদ্ধ হলে ঐ দ্রব্যগুলি কতটুকু শক্তি বা তাপ হারায়? খাদ্য-শক্তি বা fuel value সাধারণতঃ ক্যালরি (calories)-তে মাপা হয়। সুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে বাঁচতে হলে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫ বছরের ছেলে বা মেয়েদের দৈনিক গড়ে ১,০০০ থেকে ১১০০ ক্যালরি; ৫ থেকে ৭ বছরের ছেলে বা মেয়েদের গড়ে ১৩০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি; ৭ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের গড়ে ১৮০০ থেকে ২০০০ হাজার ক্যালরি; ৯ থেকে ১৩ বছরের ছেলেমেয়েদের গড়ে ২১০০ ক্যালরি এবং ১৩ থেকে ১৬ বছরের

ছেলেমেয়েদের গড়ে ২৫০০ ক্যালারি খাদ্য বা fuel value বিশিষ্ট খাদ্যের দরকার। ছেলেমেয়েদের সুস্থ এবং সবল করে গড়ে তুলতে হলে পরিমিত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ও প্রোটিন খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে থাকা দরকার। শক্তিশালী খাদ্য গ্রহণ করে সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে, খাদ্য তালিকার এই আটটি নিয়ম মেনে চল্‌তেই হবে ঃ

(১) দিনে কমপক্ষে তিনবার খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা।

(২) অন্ততঃ দু'বার প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা।

(৩) খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে দু'রকমের সব্জি-জাতীয় জিনিসের ব্যবস্থা।

(৪) দিনে কমপক্ষে দু'রকমের দেশজ অথবা গ্রামজ ফল খাওয়া।

(৫) পরিমিত পরিমাণে চিনি অথবা স্টার্চ গ্রহণ।

(৬) আটার রুটি বা পাঁউরুটি দুপুর ও রাত্রির আহারের তালিকা ভুক্ত করা।

(৭) খাদ্য তালিকায় দিনে কমপক্ষে এক পোয়া দুধ অথবা তার বদলে সয়াবীন বা চিনে বাদাম ও নারিকেল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থের ব্যবস্থা করা।

(৮) দিনে ৭।৮ গ্লাস জল খাওয়া।

উপরের নিয়ম অনুসারে সকাল, দুপুর এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা এইভাবে করা যেতে পারে ঃ—

সকালের আহার ঃ ছোলা ভিজে, আলু অথবা রাঙা আলু সেদ্ধ। চিঁড়ে অথবা মুড়ি-গুড়। সম্ভব হলে দুধ অথবা নারকেল কিংবা চিনেবাদাম। দুপুরের আহার ঃ ভাত অথবা রুটি, ডাল, আলুসেদ্ধ, কাঁচাকলা, মোচা ইত্যাদির তরকারী, শাক ও পেঁয়াজ সেদ্ধ, দু'এক টুকরো মাংস অথবা মাছের ঝোল, দুধের পায়েস অথবা দই। দুপুরে আহারের একটু পরে কাঁচা টমাটো, কাঁচা পেয়ারা, জাম, জামরুল, যেটি যখন পাওয়া যায়।

রাত্রির আহার ঃ রুটি, মাখন অথবা নারকেল কোরা, ডাল, কাঁচা

পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁপে ও ডুমুরের তরকারি, রাঙা আলু বা আলুর তরকারি কিংবা কচুর তরকারি। সম্ভব হলে শশা, কলা, বাতাবীলেবু প্রভৃতি যে কোনও একটি ফল।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতের সঙ্গে শারীরিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হলে চাই আমাদের বর্তমান খাদ্য তালিকার সংশোধন। এই রকম একটি সংশোধিত তালিকাই এখানে প্রকাশ করা হলো। চার বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যে ধরনের দেহের উচ্চতা ও ওজনের অধিকারী হয়, এখানে তারও একটি তালিকা দেওয়া হলো। এই কারণে যে, এ থেকে সবাই বুঝে নিতে পারবেন যে ছেলে-মেয়েরা উচ্চতা, ওজন এবং বয়স অনুযায়ী ঠিক মতো এগিয়ে চলেছে কিনা। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহের উচ্চতা ও ওজনের তুলনামূলক পরিমাণ হলো ঃ

বয়স	গড় উচ্চতা	গড় ওজন
৪ বছর	৩৯ ইঞ্চি	৩০ পাউণ্ড
৫ ,,	৪১'৬ ,,	৩৫ ,,
৬ ,,	৪৪'৪ ,,	৩৯'৪ ,,
৭ ,,	৪৬'৬ ,,	৪৩'৫ ,,
৮ ,,	৫০'০ ,,	৪৫ ,,
৯ ,,	৫২'০ ,,	৫৫ ,,
১০ ,,	৫৩'০ ,,	৮৫'৮ ,,
১১ ,,	৫৪'০ ,,	৬১'৮ ,,
১২ ,,	৫৫'০ ,,	৭১'০ ,,
১৩ ,,	৫৭'০ ,,	৭৭'০ ,,
১৪ ,,	৬০'০ ,,	৭৯'০ ,,
১৫ ,,	৬১'০ ,,	৮৯'০ ,,
১৬ ,,	৬২'০ ,,	৯৩'০ ,,

শিশুর ভাষা শিক্ষা

মানব-জীবনের চলার পথে ভাষা একটি প্রধান অবলম্বন। মানুষের মনের ভেতর যে সমস্ত বিচিত্র চিন্তাধারার উদয় হয় তা' এই ভাষার সাহায্যেই সে অন্যের কাছে তুলে ধরে। ভাষার সাহায্যে একে অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে এবং ভাষার সাহায্যেই একে অন্যকে বুঝতে শেখে। নানা দেশের ইতিহাস ও কাহিনী এই ভাষাই দূর দূরান্তরের মানব মনে পৌঁছে দেয়। মানুষের ব্যক্তিত্বও এই ভাষার সাহায্যেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। যিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারেন অথবা ভালো বলার জন্য বিভিন্ন মহলে যাঁর বেশ সুনাম আছে,—তিনিও ভাষার মাধ্যমেই বড়দের অথবা ছোটদের মনের কোণে একটা বিশিষ্ট আসন করে নেন। 'কথা' 'লেখা' এবং 'পড়া'—এই তিনের মধ্য দিয়ে ভাষার প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে।

মানুষের 'স্বরযন্ত্রে'র মধ্যে কতকগুলো অতি সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী আছে। সেইগুলির সাহায্যেই সবাই কথা বলে থাকে। জিহ্বা এবং ঠোঁটের সাহায্যে এই স্বরযন্ত্রগুলি পরিচালিত হয়। সমাজের আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা অনুসরণ করেই মানব-শিশুর মধ্যে ভাষার প্রথম বিকাশ দেখা দেয়। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচিত্র ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। 'যে কোনও দেশের একটি মানব-শিশুকে অন্য একটি দেশের সমাজের মধ্যে মানুষ করলে ঐ দেশের ভাষা এবং শিক্ষাই শিশু গ্রহণ করে থাকে'—মনোবিজ্ঞানীদের এইটিই হলো নবীনতম আবিষ্কার।

জন্ম-ক্রন্দন : জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কান্নাই হল মানব-জীবনে শিশুর স্বরযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার। জন্ম-ক্রন্দন বা birth-cry শিশুর স্বাভাবিক জন্মগত প্রতিক্রিয়া। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু যখন আলোকময় পৃথিবীতে জন্ম নেয়--তখন তার সারা দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন তার রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে দেয়। পৃথিবীর বায়ুর স্রোত শিশুর স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়—তাই শিশু কেঁদে ওঠে।

শিশুর জীবনে বিচিত্র স্বরধ্বনি : শিশু বিচিত্র স্বরধ্বনির মধ্য দিয়ে তার বিচিত্র আবেগ এবং অনুভূতিগুলোর প্রকাশ করে থাকে। শিশু তার ক্ষুধা, যন্ত্রণা, ব্যথা, তৃষ্ণা, ভালোবাসা প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটায়—তার বিচিত্র স্বর-ধ্বনির মধ্য দিয়ে। কয়েক মাস বয়সে শিশু আবার উপযুক্ত স্বর-চাতুর্যে শান্ত এবং উৎসাহিত হয়ে থাকে।

শৈশব-কাকলি : চার মাস বয়স থেকেই শিশু আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। এটা চলে নয় মাস পর্যন্ত। একেই শৈশব-কাকলি বলা হয়। ভাষার মধ্যে যে সমস্ত শব্দ সাধারণতঃ মানুষ ব্যবহার করে, তা শিশুর আবোল-তাবোল কথার মধ্যে ধরা পড়ে। শিশু প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে। স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথম উচ্চারিত হয় 'অ'। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে উচ্চারণ করতে শেখে 'ব' 'প' 'ম' 'গ' 'ক' এবং শেষের দিকে শেখে 'র' এবং 'ল'। শিশু সাধারণতঃ যা শোনে তাই অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে চায়। বিশেষ করে শব্দ উচ্চারণ করার আগে শিশু শব্দের সুর ঢং এবং ছন্দের অনুকরণ করে। শৈশব-কাকলিতে পুনরুক্তি দোষ প্রায়ই দেখা যায়।—যেমন দা-দা, বা-বা, মা-মা, কা-কা ইত্যাদি।

শব্দোচ্চারণ : শিশু যখন কোন শব্দের উচ্চারণ করে তখন বুঝতে হবে—ওটা কোন পরিচিত বস্তুর নাম। যেমন সে বিড়ালকে 'মিউ-মিউ' এবং গরুকে 'হাম্বা' বলতে শেখে। জন্তুর চেহারা এবং ডাকের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে তার নামকরণের কাজ

এগিয়ে চলে।

অভিনব শব্দ-সঙ্কলন : শিশু অনেক সময় অজ্ঞাত ভাবেই অদ্ভুত নাম উচ্চারণ করে বসে। শিশুর মনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে এমন সমস্ত শব্দের সৃষ্টি হয়—যার অর্থ তার নিজের জানা না থাকলেও সাহিত্যে তার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

শব্দ-সঞ্চালন : শিশু অনেক সময়ে একই নামে বিভিন্ন লোক বা ব্যক্তিকে বোঝাতে চেষ্টা করে। যেমন এই সময়ে সমস্ত বয়স্ক লোকদেরই সে—'বা-বা' এবং বয়স্ক মেয়েদের 'মা-মা' বলে ডাকে।

শব্দ-সংযোজন : শিশু তার জানা দুটো পুরোন শব্দ নিয়ে অনেক সময় একটা নতুন শব্দের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন সে লুকোচুরি খেলার সময়—'কু-কু' বলে শব্দ করে আবার বাবাকে বলে 'বা-বা'। তাই বাবা কোথাও বেরিয়ে গেলে সে বলে—'মা-মা-বা-বা-কু-কু'। এই সময়ে শিশুকে পরিহাস না করে—বড়দের কথাতে তার কথাটা কিভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝিয়ে দিতে হয়।

অর্থবোধ এবং বিশেষ্য পদের আধিক্য : প্রথম প্রথম শিশুর মনে বস্তুটির 'আকার' ছাড়া আর বিশেষ কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু যতই তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, ততই বস্তুটির অর্থ নিজের মনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে বিভিন্ন ফল এবং ফুলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তখন ছোট ছোট কথা দিয়ে মনের ভাবকে প্রকাশ করে। শিশুর সঙ্গে যাঁরা অধিকাংশ সময় কাটাতে ভালোবাসেন তাঁরাই তার অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব দেখে বলে দিতে পারেন—ঐ বিশেষ মুহূর্তে সে কী বলতে চাইছে। এই সময়ে তার কথাগুলোর মধ্যে বিশেষ্য পদের আধিক্য দেখা যায়।

বহুপদ বাক্য : একপদ বাক্য ছেড়ে শিশু আস্তে আস্তে দ্বি-পদ বাক্য এবং পরে বহুপদ বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। শিশুর ভাষার মধ্যে আস্তে আস্তে জটিলতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

ভাষণ-ভঙ্গিমা : শিশু যখন প্রথম প্রথম কথা বলতে শেখে,

তখন শরীরের নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে থাকে। ভাষা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সে শারীরিক ভঙ্গিমা ত্যাগ করতে শেখে।

স্বরগ্রামের উচ্চতা ঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু ধীর স্থির হয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে না অথবা কথা বলার সময় তার স্বরগ্রাম অত্যন্ত কর্কশ মনে হয়; এর কারণ—শৈশবের অবহেলা। যথাসময়ে শিশুর কান্নার দিকে দৃষ্টি না দিলে ক্রমশঃ সে জোরে জোরে চেঁচাতে থাকে। এর ফলে উত্তর-জীবনে তার স্বর কর্কশ হয়ে পড়ে।

উচ্চারণ বিকার ঃ অনেক সময়ই শিশু নিখুঁতভাবে একটি কথাকে উচ্চারণ করতে পারে না। তার কারণ, তার চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁরাই শব্দটিকে নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করেন না। শিশুর শ্রবণ-শক্তিকে স্বাভাবিক এবং তার উচ্চারণের বিকৃতিকে দূরে ঠেলে দিতে হলে, যাতে শৈশবেই সে শুদ্ধ উচ্চারণ এবং শ্রবণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেদিকে বড়দের দৃষ্টি দিতে হয়।

তোত্‌লামি ঃ বেশীর ভাগ সময়েই শিশু বড়দের কাছে ভয়ে কিছু বলতে ইতস্ততঃ করে। এর ফলে একটা কথা বারে বারে উচ্চারণ করে যায়। এর থেকেই তোত্‌লামির সৃষ্টি হয়। এছাড়া শিশুর আশে-পাশে কেউ যদি তোত্‌লা থাকে—তবে সে তাকেই অনুসরণ করে এবং উত্তর-জীবনে তোত্‌লা হয়ে ওঠে। অনেক সময় পরিশ্রমের ফলেই শিশুরা কথাবার্তায় তোত্‌লামো শুরু করে। বড়দের উচিত সেই তোত্‌লামির কারণটি অনুসন্ধান করে নিয়ে—যাতে সে ঐ রকম অভ্যাস থেকে বিরত থাকে, তার চেষ্টা করা। ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশু সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে। এরপর শুরু হয় বই পড়া এবং কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিজিবিজি কাটা, পরে এমন এক দিন আসে যেদিন শিশুর 'হাতেখড়ি' হয়। তখন থেকেই শিশুর ছোট্ট মাথার মধ্যে বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচ ও পাঠ্য-পুস্তকের জটিলতর সমস্যাগুলো বাসা বাঁধতে শুরু করে।

শিশুর কথা বলা

কথা সবাই বলে। শিশুর আধ আধ বুলি থেকে মুমূর্ষুর অসংলগ্ন উপদেশ—সবই কথা বলারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কথা বলতে আবার শিখতে হয়। অবশ্য কাউকে যদি বলা যায় যে তিনি যথাযথরূপে কথা বলতে পারেন না অথবা কথা বলার বিশেষ ভঙ্গিমাগুলি আয়ত্তে আনতে পারেননি তবে তিনি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হন। কথা বলাটাই যদিও মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, কিন্তু ক'জন যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারেন? আবার কথা বলারও বিশেষ কায়দা ও ভঙ্গিমা আছে। সেটা ছোটবেলা থেকে আয়ত্ত করতে না পারলে বড় হয়ে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়। তখন কেউ নাম পায় 'বাচাল' বলে, আবার কেউ নাম কেনে 'বুনো' বা 'বোকা' বলে। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুদের কথা বলার আট-ঘাটগুলি শিখিয়ে দিতে হয়।

বড়দের সঙ্গে কথা বলতে সমস্ত সময়ই যাতে ছোটরা বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে—সেটা বিশেষ করে মা-বাবাকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। আবার এটাও তাঁদেরই খেয়াল রাখতে হয় যেন ছোটরা অতি বিনয় দেখাতে গিয়ে ভয় পেয়ে আমতা আমতা করে কথার খেই না হারিয়ে ফেলে। শিশু যাতে তার বক্তব্য বিষয়টি বেশ ভালো-ভাবে গুছিয়ে নিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ ও মিষ্টি সুরে বড়দের কাছে উপস্থিত করতে পারে সেদিকে মা-বাবার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়।

আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরা, কথা-বার্তার মধ্যে দিয়ে যদি তারা তাদের মনের সংযমটি ছোটবেলাতেই অভ্যাস করতে পারে—সেদিকে

মা-বাবাকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। এই অভ্যাসটি করতে পারলেই উত্তর-কালে সেই শিশুটিই সকলের আদর কুড়িয়ে নিয়ে দশ জনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারে।

বন্ধু-বান্ধব খেলার সাথীদের সঙ্গে ছোটরা কথা বলতে শিখবে এমন ভাবে যাতে অন্যরা সকলেই কথাগুলি উপভোগ করতে পারে। গোম্‌ড়ামুখোরা কিন্তু কখনই সঙ্গীদের মন জয় করতে পারে না। তবে এটুকুও মনে রাখা উচিত—কোনও কারণেই কারো এমন আনন্দ বা পরিহাস করা উচিত নয়—যাতে অন্যের মনে আঘাত লাগতে পারে। এই কারণেই সমস্ত সময় কথা-বার্তায় ও ব্যক্তিগত হাসি-ঠাট্টায় শিশু যাতে অন্যায় এবং ব্যক্তিগত পরিহাসকে এড়িয়ে চলতে সে শিক্ষাই হবে কথা বলার প্রকৃত শিক্ষা।

সুন্দরভাবে গুছিয়ে যে কোনও কথা বা গল্প বলতে অভ্যাস করাতে পারলেই—তা থেকে শিশু বাক্‌-সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আমরা সাধারণতঃ কথা বলতে শুরু করলে কোথায় থামতে হয় সেটা জানি না। আবার কথা বলার সময় মনে রাখতে হয় যেন একই কথা বারে বারে বলা না হয়ে যায়। তা ছাড়া যখন একসঙ্গে অনেকে কথা বলছেন—তখন অন্যকেও কথা বলতে সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে অন্যরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে এবং সেই কথা বলিয়েকে তারা সমস্ত সময় এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে। তাই কথা বলার সময় ছোটরা যেমন অন্যের সঙ্গে কথা বলছে আবার তেমনি অন্যের কথাগুলিও সে আগ্রহভরে শুনছে—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেকে আবার শ্রোতার মন আকৃষ্ট করবার জন্য তার অত্যন্ত কাছে গিয়ে, এমন কি তাকে টেনে বা ধাক্কা দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেন। শিশুকে যদি এ ধরনের অভ্যাস পরিহার করতে মা-বাবা অভ্যাস না করান তবে বড় হলে তাকে সবাই এড়িয়েই চলবে। তখন আর সেই মুদ্রাদোষ দূর করা সম্ভব হবে না।

শিশুর কথা বলা

মনীষী ইমার্সন বলেছেন : 'সকল মানুষেরই বুদ্ধি আছে, তবে বুদ্ধির তারতম্য প্রকাশ পায় তার কর্মচাতুর্যে।' একথা সহজেই বলা যায় যে কথা সবাই বলে—তবে ক'জন আগ্রহশীল শ্রোতা পায় তা বলা বড় কঠিন। শিশুকাল থেকে নিপুণভাবে কথা বলার শিক্ষা পেলেই শিশু বড় হয়ে সকলের মন জয় করতে পারে।

শিশু জন্মের পর থেকেই প্রথম কান্নার মধ্য দিয়ে তার কথা শুরু করে। শৈশব-কাকলির ভেতর দিয়েই তার ভাষ রূপ নেয়। তাই শৈশবেই শিশুর মধ্যে যাতে ভাষার সৌন্দর্যবোধ জাগে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে পারলেই অনেক দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

ছোটবেলা থেকে পরিষ্কার করে কথা না বলার অভ্যাস বা জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলার অভ্যাসের ফলেই অনেক সময়ই তা তোত্‌লামীতে দাঁড়ায়। অনেক সময় কোনও তোত্‌লা লোককে অনুকরণ করতে গিয়ে শিশু তোত্‌লা হয়ে পড়ে। শৈশবে এই সমস্ত ব্যাপারগুলি যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে পারলেই শিশু সুবক্তা হয়ে দেখা দিতে পারে। তবে যত্ন না করলে তা থেকে ফল আশা করার মতো দুরাশা বোধ করি আর কিছুই নেই। অনেকে কথা বলার সময় অভ্যাস বশে অনেক মুদ্রাদোষের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন অনেকেই কথা বলার সময় 'মাইরি' 'সত্যি বলছি', আবার অনেকে যেখানে সেখানে 'মানে' কথাটা জুড়ে দেয়। এর ফলে অনেক সুন্দর কথা অনেকের কানে কুৎসিত বলে মনে হয়। বিশেষ করে যারা উত্তরকালে কথা বলার পেশা নিতে চায় তাদের এটা একটা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের কলেজ জীবনে এমন একজন অধ্যাপকের সঙ্গ আমরা পেয়েছিলাম—যাঁর মুদ্রাদোষ ছিল কথার ফাঁকে ফাঁকে 'Is it clear' কথাটি ব্যবহার করা। পরে এমনও হতো যখন সেই উচ্চারণ শোনাত 'ইজ-ই-লার' এর মতো। ছাত্ররা তাই ঐ অধ্যাপকের কোনও গম্ভীর কথার মধ্যেও এমন ভাবে হেসে উঠত—যার জন্য

তাঁকে লজ্জা পেতে হতো। মনোবিজ্ঞানীরা এই মুদ্রাদোষজনিত বিষয়-গুলির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন : 'মুদ্রাদোষ হল কোনও বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির ঘন ঘন পুনরাবৃত্ত ও তার অশোভন আর অসংলগ্ন প্রয়োগ।' তাই ভালোভাবে কথা বলতে শেখানো শিশুকে যে কত প্রয়োজন—তা এই সমস্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে।

যে ক'টি অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শিশুকে এগিয়ে নিয়ে গেলে কথা বলার ব্যাপারে তারা ভালো ফল দেখাবে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন—তা হলো :

১। কথা বলার সময় যেন সে ঘাবড়ে না যায়।

২। বিষয়বস্তু যেন সমস্ত সময় গুছিয়ে বলতে অভ্যস্ত হয়।

৩। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে যেন সে সমস্ত সময় সচেতন থাকে।

৪। গলার স্বর যতদূর সম্ভব মিষ্টি ও সুশ্রাব্য করার দিকে যাতে সে লক্ষ্য রাখে।

৫। কথা বলার শুরু ও শেষ সম্বন্ধে যাতে সমস্ত সময় তার খেয়াল থাকে।

৬। কথা বলার সময় অন্যকেও কথা বলতে সুযোগ দেওয়ার নীতিটিকে যেন সে মনে রাখতে শেখে।

৭। উচ্চারণ ও শব্দ চয়ন সুন্দর হওয়ার দিকে যাতে সমস্ত সময় তার লক্ষ্য থাকে।

৮। রসাত্মক কথা যাতে কখনই ব্যক্তিগত আক্রমণে না দাঁড়ায় সেদিকে সে যেন লক্ষ্য রাখতে শেখে।

৯। কথা বলার সময় নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে যাতে যথেষ্ট সচেতন থাকে।

১০। অন্যের কথায় অভিভূত না হয়ে পড়ে—নিজের কথাটি যাতে অন্যকে বুঝিয়ে বলতে শেখে।

শিশুর শিল্পী-মন

প্রত্যেক স্বাভাবিক শিশুর মধ্যে শিল্পীসুলভ মনের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণ হয় তা প্রকাশিত হওয়ার জন্য সব সময় পথ খুঁজে বেড়ায়। এর ফলেই শিশুর মধ্যে সত্যিকারের শিল্প-প্রতিভার সৃষ্টি হয়। শিশুর স্বাভাবিক কল্পনা-শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করলে—ওদের মধ্যেই প্রকাশ পায়—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলালের প্রতিভা।

জন্ম থেকেই শিশুর মনে চলে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। কোনও একটা কিছু হাতের কাছে পেলে পরেই—সে তা নিজের মনের মতো করে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তারা হাতের কাছের জিনিসটিকে বারবার ভেঙ্গেচুরে আবার জুড়তে চেষ্টা করে। বড়রা কিন্তু এই অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করেন না। এর ফলে গাল-মন্দ খেয়ে শিশু তার শিল্প-প্রতিভাকে চিরদিনের মতো ঐখানেই সমাপ্তি টানে।

শিশুকে স্বাভাবিক উপায়ে সমস্ত কিছু ধরা-ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় হতে দেওয়াই হল—তাকে হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাড়তে দেওয়া। সৌন্দর্যানুভূতির গভীরতা, আনন্দ আস্বাদনের নিবিড়তা এবং শিল্পী-মনের কোমলতা—সমস্ত শিশুর মধ্যেই সুপ্ত আছে। সেই সুপ্তি থেকে ঐ সমস্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হলে—শিশুকে বস্তু-জগতের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হয়। তা না হলে অনেক প্রতিভাই অকালে ঝরে পড়ে।

আঠারো মাসের একটি শিশুকে যদি কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে

খেলা করতে দেওয়া হয়, তবে সে হিজবিজি আঁচড় কাটে। তখনও ওর মধ্যে কোন কিছু এঁকে প্রকাশ করার ইচ্ছা দেখা যায় না। তবে কাগজ আর পেন্সিলের সঙ্গে তা'র একটা আত্মীয়তা জন্মে। যার থেকে দু'বছর বয়সে ওর ঐ আঁচড়গুলো একত্রে মিলিত হয়েই একটা রেখাপুঞ্জের সৃষ্টি করে। দু'বছর বয়সের একটি শিশুকে যদি কাদার ঢেলা দেওয়া হয়—প্রথমে সে হাত ময়লা হওয়ার ভয়ে তাতে হাত দেয় না। কিন্তু পরে ঢেলার দিকে আকর্ষণ জাগে এবং তা নিয়ে খেলা করতে শুরু করে। প্রথমে ওটাকে গোল করে পাকিয়ে নেয়, তারপরে ওটি দিয়েই কমলালেবুর মতো দুদিক চেপ্টা গোলের সৃষ্ঠি করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এটাই ভাস্কর্য শিল্পের রূপ নেয়।

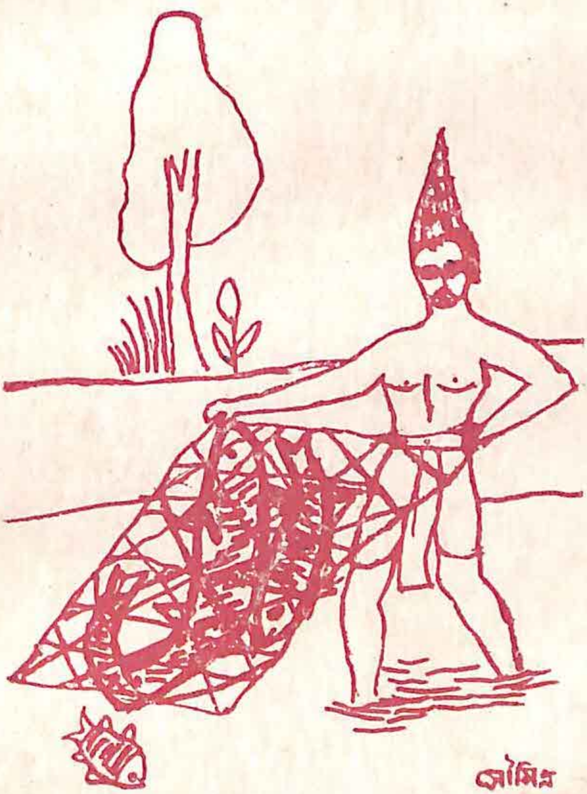
আড়াই বছর বয়সে শিশুরা কতকগুলো হিজিবিজি রেখা টেনে সেগুলোকে হাত, পা, মাথা, কান, চোখ, নাক প্রভৃতি নামকরণ করে। কিছু একটা এঁকে তার একটা নাম দিতে এই সময় শিশুরা খুব ভালোবাসে। তিন বছর বয়সে শিশু প্রথমে কী আঁকবে তা বলে নিয়ে আঁকে। অধিকাংশ সময়েই ওর কথা বলার সঙ্গে আঁকার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে শিশু যা আঁকতে চায়—তার সঙ্গে মূল বক্তব্য অথবা চিত্রের খানিকটা মিল থাকে। যদি তখন সে মডেল হিসেবে কিছু পায়, তবে সেটা তার শিল্প প্রতিভাকে এগিয়ে নিতে বেশ কিছুটা সাহায্য করে। মাটির ঢেলা অথবা কাদা নিয়েও সে ঠিক ছবির মতো করেই সবকিছু তৈরী করতে চেষ্টা করে।

শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব বস্তুটির সঙ্গে তার আঁকা ছবিটির সাদৃশ্য ফুটে উঠতে থাকে। ওর মধ্যে সত্যিকারের শিল্পী এসে হাজির হয়। প্রথম প্রথম শিশুকে মানুষ আঁকতে বললে, সে একটা গোল টুপির মতো করে—তার নীচে খানিকটা চুলের মতো দিয়ে মানুষ বলে চালিয়ে দেয়। তারপরে একটা লম্বা মতো কাপড় করে তার তলায় দুটো পা'র মতো এঁকে দিয়ে মানুষ বলে চালায়। এই



পাল্কী চলে

শিল্পী : শ্রীকুশল হোম রায়
(বয়স ৬ বৎসর)



জেলে

শিল্পী : সৌমিত্র শঙ্কর দত্ত
(বয়স ৮ বৎসর)

ভাবেই তার মধ্যে শিল্প-প্রতিভা আস্তে আস্তে প্রকাশ পেয়ে তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তা থেকেই নতুন 'শিল্পী' জন্ম নেয়।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি এবং জ্ঞান শিশুর শিল্পী-মনকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। এরপর আস্তে আস্তে এই প্রভাব কমে গিয়ে চিত্রাঙ্কণ এবং ভাস্কর্যে বাস্তবধর্মীরূপ নিতে শুরু করে।

বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন দেশের শিশুদের আঁকা ছবিগুলো বিশ্লেষণ করলে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আদিম বা অসভ্য-জাতির শিশুদের সঙ্গে সভ্য-জাতির শিশুদের তুলনামূলক কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না। ছবি আঁকা অথবা মূর্তি তৈয়ারী করার ক্ষমতার সঙ্গে বুদ্ধি, বংশধারা, কল্পনাপ্রবণতা প্রভৃতির একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। সেই কারণেই আদিম জাতির সঙ্গে সভ্য-জাতির শিশুর চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিশু আপন খেয়াল-খুশি বসে যে সমস্ত ছবি আঁকে অথবা মাটির মূর্তি গড়ে তা থেকে অতি শৈশবেই বুঝতে পারা যায়, তার মধ্যে কী ধরনের শিল্প-প্রতিভা সুপ্ত আছে। ছবি আঁকা অথবা মাটির পুতুল তৈরীর মধ্যে যে কল্পনা রূপায়িত হয়, তার মূলে যে শিশুর অবচেতন মনের ক্রিয়া-কলাপগুলি বিশেষভাবে কাজ করেছে তা প্রকাশ পায়। শিশুর শিল্পী-মনের মধ্যেই মনোবিজ্ঞানীরা মানব-সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন বলে আশা করেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আজও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই।

ছবি অথবা মাটির পুতুল ইত্যাদি তৈরী ছাড়াও অনেক শিশুই কাঠের কাজ, বোনার কাজ এবং কাগজ কাটার কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পী-মনের পরিচয় দেয়। ছোটবেলায় ঐ সমস্ত কাজে উৎসাহ পেলেই বড় হয়ে সে একটি সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পীতে পরিণত হয়। খেলার ছলে শিশু যে শিল্প-প্রতিভার দিকে এগিয়ে চলে তাকে নিঃসন্দেহে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

বড়দের বিশেষ করে মনে রাখতে হয় যে, শিশু শিল্প-সৃষ্টির সাধনার মধ্য দিয়েই নিজেদের সৌন্দর্য-জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে থাকে। সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে নিজের ধৈর্য ও উদ্যমকে বাড়িয়ে তোলে এবং নিজের চিত্তবৃত্তির সংস্কার সাধন করে জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

শিশুর বয়স অনুযায়ী মান নির্ধারণ করে তাকে শিল্প কাজে এগিয়ে দিতে পারলেই তার মধ্যে শিল্প-প্রতিভার বিকাশ দেখা দেয়। বয়স অনুসারে শিশুর মান নিধারণ করতে হলে—তার বয়সকে এইভাবে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রথম বিভাগ (২ থেকে ৪ বছর) ঃ শিশু এই বয়সে স্বাভাবিক উপায়ে খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে শিল্প-প্রতিভার বিকাশ করে। বেশীর ভাগ সময়ে কতকগুলি হিজিবিজি কেটে অথবা মাটির ঢেলা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে।

(২) দ্বিতীয় বিভাগ (৪ থেকে ৯ বছর) ঃ শিশু মুখে যে বস্তুর নামকরণ করে—ছবিতে তার খানিকটা ছায়া ফেলতে পারে। খানিকটা শিল্পী-মনের পরিচয় ওরা ওদের ছোট-খাট কাজের মধ্যে দেখাতে পারে।

(৩) তৃতীয় বিভাগ (৯ থেকে ১২ বছর) ঃ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকাজে মন লাগাতে পারে। ছবি এবং মাটির পুতুল তৈরীর কাজ ছাড়াও কাঠের কাজ, বোনার এবং কাগজ কাটার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে।

(৪) চতুর্থ বিভাগ (১২ থেকে ১৬ বছর) ঃ এই বয়স থেকেই শিশু একটা বিশেষ দিকে নিজের শিল্প-প্রতিভাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অর্থকরী শিল্পের দিকেও তার মন যায়। নিজের সৃষ্টির জন্য নিজে গর্ব অনুভব করে থাকে।

শিশুর খেলা-ধুলো

খেলতে ভালোবাসে না এমন শিশু আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই খেলতে ভালোবাসে। মানুষই হোক আর ইতর প্রাণীই হোক—সকলের জীবনেই খেলাধুলো একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটা সত্য বলে স্বীকৃত হতো না। খেলাধুলো মানুষের যে একটা স্বভাবজাত ধর্ম—তা আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে শিশু-শিক্ষার ধারাটাও গেছে পল্‌টে। খেলাধুলোর মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে যে শিশু আনন্দের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে—সেটা বলেছেন ফ্রোবেল, মণ্টেসরী প্রভৃতি মনীষীরা। ওঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিশু-শিক্ষায় যুগান্তর এনেছে তা আজ আর কারো অজানা নেই। খেলা-ধুলোর ব্যাপারে শিশুকে উৎসাহিত করে কোন্ মনোবৃত্তি? এ সম্বন্ধে অবশ্য মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে—ছোটদের মধ্যে বড়দের মতো শক্তি অর্জনের যে ইচ্ছা, তাই শিশুকে খেলাধুলোর দিকে আকৃষ্ট করে তোলে। আবার কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী মনে করে থাকেন যে: শিশু আনন্দ পায় বলেই খেলতে ভালোবাসে এবং তার মধ্যে যে অনন্ত 'শক্তি কাজ করে চলেছে, তাই তাকে খেলাধুলোর দিকে আকর্ষণ করে থাকে।'

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা বুঝতে পারে যে, মা-বাবাও এক দিন তাদের মতোই ছোট্ট ছিলেন এবং আস্তে আস্তে সেও মা-বাবার

মতোই বড় হয়ে উঠবে।—এ চিন্তা তাকে খুব আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে মনে মনে খুব কৌতুকও অনুভব করে থাকে। আর এই সমস্ত চিন্তাধারার প্রকাশই দেখা দেয় ছোটদের খেলাঘরের মধ্যে দিয়ে। শিশুর খেলাধুলোর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের আর একটি দিক হলো যে তারা খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাজের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এই ব্যাপারে অবশ্য পারিবারিক ভাবধারা এবং পরিবেশই তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে থাকে। অভিনয়ের ছলে ছোটরা রাম-রাবণের যুদ্ধ, হিমালয় অভিযানে, রেলগাড়ী এবং বাস কণ্ডাকটারের অভিনয় প্রভৃতি খেলার মধ্য দিয়েই ভয়কে কাটিয়ে উঠে সাহসী হওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে থাকে। অনেক সময় শিশু নিজেকে খুব বলশালী মনে করতে গিয়ে বীভৎস হত্যাকাণ্ডেরও অভিনয় করে থাকে। শিশুর এই মনোবৃত্তিকে উপযুক্ত সময়ে মার্জিত এবং কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে অমানুষে পরিণত হয়ে সমাজের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই শক্তিকেই সুপথে পরিচালিত করতে পারলে দেশ এবং দশের কল্যাণ হয়ে থাকে।

শিশু জন্মের প্রথম বছরে সাথীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভব করে না। এই সময়ে রঙীন কাপড় অথবা সেলুলয়েডের তৈরী পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। বিছানার ওপরে লাল রঙের ফুল অথবা রঙীন রুমাল ঝুলিয়ে রাখলে তা দেখে শিশু হাত-পা নেড়ে খেলতে চায়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ চালনার সামগ্রী কাছাকাছি না পেলে অসন্তুষ্ট হয় এবং চীৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। এ সময়ে কাঠের তৈরী রঙীন ঝুন্‌ঝুনি পেলে কান্না থামিয়ে খেলার আনন্দে মেতে ওঠে। শিশুর খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে পারে সেদিকে বড়দের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। দ্বিতীয় বছরে শিশুকে কাদামাটির ঢেলা দিলে সে নানা রকমের পুতুল, পাখী ইত্যাদি তৈরী করতে চেষ্টা করে। ড্রয়িং অথবা আঁকার

সরঞ্জাম কাছে দিলে 'হিজিবিজি' কেটে কাগজ ভরিয়ে দিতে চায় এবং এই থেকে সে ভাবী জীবনে শিল্পী হয়ে ওঠার শিক্ষা নেয়। কাগজ এবং কাঁচি হাতে পেলে, তা কেটে-কুটে একটা নামকরণ করে নিয়ে বড়দের কাছে বাহবা পেতে চায়। চাল-চলন এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিশু যদি ছোট বয়সেই শিক্ষা না পায়, তবে অযথা সমস্ত কিছুর অপব্যবহার করে সংসারে একটা বিশৃঙ্খলার ঝড় বইয়ে দিতে চেষ্টা করে। অথচ খেলার মধ্যে দিয়ে তার সহজাত কল্পনাগুলোর রূপ দিতে পারলে সে খুশি মনে বড় হয়ে ওঠে। নার্সারী স্কুলে এই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে শিশুকে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা বিভিন্ন দেশে চলেছে, তাকে গ্রহণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখকেই আমাদের বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

শিশুকে খেলাধুলো অভ্যাস করানোর আগে নীচের কথা ক'টি বেশ ভালোভাবে ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। কথা ক'টি হলো ঃ—

(১) শিশুকে যে খেলা দেওয়া হবে তা তার মনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত কিনা? (২) বয়স অনুযায়ী খেলাটি তার দৈহিক বিকাশের সহায়ক কিনা? (৩) বাড়ির মধ্যে খেলাটির জন্য সে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে পারবে কিনা? (৪) তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পক্ষে খেলাটি সহায়ক কিনা? (৫) তার স্বাস্থ্যের পক্ষে খেলাটি উপযুক্ত কিনা?

যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলা অনেক সময় শিশুর মনকে অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান দেয়। তাই ছুতোরের যন্ত্রপাতি নিয়ে সে খেলতে ভালোবাসে। এই উৎসাহকে বাড়িয়ে তুলতে পারলেই তার দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ উপযুক্ত সময়ে সম্ভব হয়ে থাকে। আর হয়ে থাকে পুতুল এবং খেলনা তৈরীর মধ্যে দিয়ে তার সৃজনী শক্তির বিকাশ।

শিশু খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই অঙ্গচালনা করে নিজের স্বাস্থ্যকে সুন্দর এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাকে গানের তালে তালে নাচতে শেখানো এই কারণে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। গান

বা বাজনার তালে তালে নাচতে শেখালে তার মনে সুর এবং তাল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় এবং এ থেকে সে মনের আনন্দের খোরাকও সংগ্রহ করে নেয়। ছোট বেলায় ব্রতচারী অথবা সমবেত নৃত্যের অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি দিলে শিশুর স্বাস্থ্য সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় মা-বাবা সন্তানের লেখাপড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেন। যার ফলে শিশু খেলাধুলোয় বিমুখ হয়ে ঘরকুনো হয়ে পড়ে। ফলে হয়তো ভবিষ্যতে সে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু আবার এই কারণেই তাকে অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে কোনও রকমে এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে দেখা যায়। এমনিতেই তো ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আবার ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াতেই সময় কাটাতে হয় বেশীক্ষণ। এতেও যদি মা-বাবা সন্তুষ্ট না হন, তবে ছোটরা স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে নিজের মনকে বুড়োটে এবং স্বাস্থ্যকে পঙ্গু করে তুলবে—তাতে আর আশ্চর্য কি ? এ কথাটা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে—ত্'বেলা ওষুধ গেলার মতো পড়ার বই মুখস্থ করলেই শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল দেখানো যায় না। বরং সু-সম লেখাপড়া এবং খেলাধুলোর মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে প্রতিভার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শিশুর খেলাধুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী টেরম্যান বলেছেন ঃ 'প্রতিভাবান্ ছেলেমেয়েরা, সাধারণ ছেলেমেয়েদের চাইতে একলা নির্জনে খেলতে ভালোবাসে এবং বেশীর ভাগ সময়েই দিনে ত্'ঘণ্টার বেশী অন্য সাথীর সঙ্গে খেলতে চায় না। সমস্ত সময়ে তারা তাদের চাইতে বয়সে বড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে চায় এবং তাদের সঙ্গেই মিলেমিশে খেলতে ভালোবাসে।'

সব দেশের মেয়েরাই সাধারণতঃ ঘরকন্নার খেলা খেলতে ভালোবাসে। ঘর সাজানো, রান্নাবান্না, গৃহিণীর অভিনয়, পুতুলের বিয়ের মধ্য দিয়েই

মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে এগিয়ে চলে। মায়ের কাছ থেকে ঘুম-পাড়ানি ছড়া শিখে নিয়ে নিজের পুতুলকে ঘুম পাড়ায়। পুতুল ঘুমুতে না চাইলে ভয় দেখায়। এইভাবে শিশু হুবহু নিজের মা'কে অনুকরণ করে নিয়ে, সু-গৃহিণীর ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে পরীক্ষা করে নিয়ে যার পক্ষে যে ধরনের খেলা উপযোগী, সে-ধরনের খেলার প্রবর্তন করতে পারলে খুব ভালো ফল দেখা দেয়। এ ছাড়া খেলাধুলোর মধ্য দিয়েই শিশুর বুদ্ধি, প্রতিভা আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বিভিন্ন রকমের খেলাধুলোর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শিশু যে-সমস্ত শিক্ষাকে গ্রহণ করে তা হলো :

(১) মনের আনন্দকে বজায় রাখার শিক্ষা। (২) অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং এক সঙ্গে চলার শিক্ষা। (৩) শক্তি, সামর্থ্য এবং জ্ঞান লাভের শিক্ষা। (৪) সৎ-প্রবৃত্তি, ধৈর্য এবং সু-বিবেচনার শিক্ষা। (৫) আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের শিক্ষা।

বাল্য ও কৈশোর

এক বছর ঃ

মনোবিজ্ঞানের সব চাইতে বড় আবিষ্কার হলো, যে ঃ 'দুটি শিশু কখনও হুবহু একরকম হয় না। মানুষের মধ্যে এক ধরনের অনেক সাদৃশ্য বর্তমান থাকলেও—দৈহিক কিংবা মানসিক দিক থেকে সমস্ত রকমের সাদৃশ্য কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না।'—একথা সব মনোবিজ্ঞানীরাই আজকের দিনে স্বীকার করে নিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষে শিশু কম-বেশী প্রতিভাবান্ হয়ে থাকে। প্রথম বছরে যে সমস্ত অবস্থা এবং পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিশু অগ্রসর হয়—তা-ই তার ভাবী জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এর জন্যেই এই সময়টিতে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী।

শিশু প্রথম তিন মাসে মাথা তুলতে পারে। কোনও কিছু সামনে ধ'রে পরে তা সরিয়ে নিলে, তার অনুসরণ করতে পারে। হাতের মধ্যে কোনও কিছু গুঁজে দিলে, তা মুখে দিয়ে চুষতে শুরু করে। এই সময়ে আলোর প্রতি তার অনুভূতি জাগে এবং আলোকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে।

তিন মাস থেকে ছয় মাসের ভেতর শিশু হাত, পা এবং চোখ প্রভৃতি ব্যবহার করতে শুরু করে। চারদিকে তাকাতে ভালোবাসে এবং কোনও বস্তু বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার কোনওটা মোটেই পছন্দ করে না। নানারকম অনুভূতির ভাণ্ডার শিশু এই সময়েই পূর্ণ করে নেয়। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ছয়

মাসের শেষের দিকে বসতে চেষ্টা করে এবং পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চায়। এ সময়ে কিন্তু দূরের জিনিসের প্রতি শিশু মোটেই আকৃষ্ট হয় না। প্রথম বছরের শেষের দিকে হামাগুড়ি দিতে চেষ্টা করে এবং হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে ভালোবাসে। মা'র কাছে থাকতে ভালোবাসে এবং মা'র গলা পেলেই কান্না থামায়।

ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুর স্মৃতি শক্তির উন্মেষ হয়। কোনও জিনিস তার কাছ থেকে সরিয়ে নিলে ভাবতে শেখে ও মনে রাখে। এগুলো তার বিভিন্ন আচরণে প্রকাশ পায়। মানুষের উপর এই সময়ে তার কৌতূহল জাগে এবং আশ-পাশের ঘটনাকে অনুসরণ করতে শেখে। এই সময়ে শিশু খুব আবোল-তাবোল বকতে ভালোবাসে। তাই এক কথায় একে শিশুর 'কলকলানি'র যুগ বলা যেতে পারে।

প্রথম বছরে শিশু খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কান্না-হাসির মধ্য দিয়ে সকলকে জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে। খাদ্য এবং পোশাক দেখে নিজের মনে হেসে ওঠে। কোনও কিছু হাতের কাছে পেলেই তা মাটিতে ফেলে দেয় এবং সেটা আবার হাতের কাছে ফিরে পাওয়ার জন্য বায়না ধরে। প্রথম বছরের শেষের দিকে গান, কবিতা এবং ঘুমপাড়ানি ছড়ার দিকে শিশু ঝুঁকে পড়ে। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার পর মায়ের মুখে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রথম বছরের শেষ দিকেই দাঁত বেরুতে শুরু করে এবং পাঁচটা পর্যন্ত দাঁত বেরোয় এবং সে 'দা-দা', 'মা-মা' বলতে পারে।

সাধারণতঃ শিশু যদিও বড় হয় মা'র কাছেই তবুও বাবারও যে তার মানুষ হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব খুব কম নয়—এ কথাটা আজ বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে—'বালক এবং বালিকারা উভয়েই যদি পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পায় তবে তাদের জীবন পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মা-বাবা উভয়েই যদি

পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে যান, তবে শিশুর সমস্ত সমস্যাই সহজে সমাধান হয়ে থাকে।' ছোটদের সঙ্গে যাঁরা মেলামেশা করেন তাঁরা নিশ্চয় এইটুকু লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের মধ্যে নানারকমের সমস্যা রয়েছে—যেগুলোর সমাধান একান্তভাবে প্রয়োজন। যেমন একটি শিশু লাজুক—কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসে না বা পারে না ; আবার কোনও শিশুর সঙ্গে এক জায়গায় মিলিত হলেই মারামারি বা হুল্লোড় লাগিয়ে দেয়। বিশেষ করে যে শিশুর জীবনে কোনও কিছুর অভাব নেই, সেও এর জিনিসটা না বলে নিয়ে, ওর জিনিসটা নষ্ট করে দিয়ে খেলতে ভালোবাসে এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটা স্বভাবে দাঁড়ায়। তাই সে শৈশবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা তার পরের জীবনে বিশেষভাবে কাজে লাগায়। বিখ্যাত ইংরেজ কবি তাই বলেছেন : 'Morning shows the day, as child shows the man.'

ভাবী জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতা, আশা, আকাঙ্খা এবং আচরণ সব কিছুরই ভিত তৈরী হয় এই শৈশবেই এবং শিশুর জীবনের প্রথম বছরটি এই কারণেই সব থেকে মূল্যবান বলা যেতে পারে। এই সময়টিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গড়ে উঠলেই ভাবী জীবনে সে মহৎ হয়ে দেখা দেয়।

দুই বছর :

শিশু দ্বিতীয় বছরে এক নতুন জগতে প্রবেশ করে। প্রথম বছরের জীবনের পদক্ষেপে সে দ্বিতীয় বছরে হাঁটতে শেখে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে। নতুন দৌড়াতে শিখে চারদিকে আনন্দে ছুটে বেড়ায়। তার চারধারের ফলে-ফুলে শোভিত পৃথিবীকে আবিষ্কার করে। বই নিয়ে হিজিবিজি কাট্‌তে বা বইয়ের পাতা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলতে ভালোবাসে।

দ্বিতীয় বছরে শিশু খুব অনুকরণ প্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এই সময়ে

মা-বাবাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। ভালোবাসা, স্নেহ এবং মমতা সম্বন্ধে শিশু সচেতন হয়ে ওঠে। তার ব্যবহারে সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। শিশু যে সমাজ অথবা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে তারই প্রতিফলন তার সমস্ত কাজের মধ্যে দেখা দেয়। তাই এই সময়ে শিশুর চরিত্র গঠনের দিকে মা-বাবার লক্ষ্য থাক্‌লে ভাবী জীবনে সে সংযত এবং সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে। শিশু এই সময়েই আধো-আধো ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ এবং কষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে মা'কে নিজস্ব পদ্ধতিতে বোঝাতে চেষ্টা করে। মা'কে এই সময়ে শিশুর মুখকে তার মনের মুকুর হিসেবে গ্রহণ করতে হয় এবং সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে অনুধাবন করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়। স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয় এই সময়েই। কোনও কিছু কোথাও রাখলে স্মৃতিশক্তি প্রয়োগ করে তা খুঁজে বের করতে পারে। মা-বাবা যেটা পছন্দ করেন না, তা মনে রাখে এবং সঙ্গীদের কাছে তা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকে। খবরের কাগজ অথবা বই পড়ার ভাণ করে এবং বাবা কিভাবে সিগারেট খান তা সকলকে অনুকরণ করে দেখাতে চেষ্টা করে। আশে পাশে যা ঘটছে তা অঙ্গবিন্যাসে অন্যকে দেখাতে ভালোবাসে।

বিশেষভাবে এই সময়ে শিশু হাতে আঁকা ছবি এবং ফটোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সুর, ছন্দ এবং ছড়ার দিকেও ওরা আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বছরে অভিভাবক-অভিভাবিকাকে শিশুর খেলাধুলা এবং কাজকর্ম যাতে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখাতে হয় কারণ এই সময়েই সে ভাবী জীবনের পূর্ণতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ করে থাকে। মা'কে এই সময়ে খেয়াল রাখতে হয় যেন তিনি তাঁর ছোট্ট ছেলেটিকে মাত্রাহীন আদর দিয়ে অর্থাৎ 'এটা করো না,' 'ওটা করো না' প্রভৃতি নিষেধের মধ্য দিয়ে পঙ্গু করে না তোলেন। কারণ শিশুর দ্বিতীয় বছরের অগ্রগতির মধ্যেই তার শক্ত সবল এবং সাহসী নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাগুলো সুপ্ত থাকে।

বর্তমানকালের মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে এইটুকু জানা যায় যে, শিশুর জীবনে এই দ্বিতীয় বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই সে নড়াচড়া করতে অভ্যস্ত হয়। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে জীবন পথে এগিয়ে চলে। চুমুক দিয়ে দুধ খেতে শেখে। বুঝতে শেখে যে, ফল খাওয়া যায় কিন্তু বইটিকে খাওয়া চলে না। নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়তে পারে এবং অন্যকে তা দেখাতেও ভালোবাসে। শিশুকে 'হাত কোনটি', 'মুখ কোনটি' জিজ্ঞেস করলে, হাত দেখায়, মুখ দেখায়। দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে—ঘড়ি, চশমা, টেবিল, বই, বাক্স প্রভৃতির ছবি দেখালে জিনিসগুলোর নাম ঠিক ঠিক বল্‌তে পারে।

বেশীর ভাগ সময়েই অন্যের সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা করে ও নতুন কোনও একটা শব্দ শিখলে সেটা সব সময়ই উচ্চারণ করতে চায়। তা ছাড়া ভাষার মাধ্যমে এই সময়েই শিশুর সমাজজীবন সহজ হয়ে ওঠে। তার ভাষা অনেক সময় এক নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ে গড়ে ওঠে। যার সঙ্গে মা বা বাবা মোটেই অভ্যস্ত নন। তাঁরা তাই তার ভাষা বুঝতে না পেরে নানাভাবে তিরস্কার করেন এবং তাতে শিশু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সে নিজের মন থেকে অনেক সময় নতুন শব্দের সৃষ্টি করে। তখন মা-বাবার কর্তব্য নতুন শব্দটির অর্থ বুঝে নিয়ে তার কথা বলার কাজকে সহজ করে তোলা। তা না হলে ওর ভাষা শেখার কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

দ্বিতীয় বছরটিতে শিশু খুব স্বার্থপর হয়, নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভালোবাসে। ওর কোনও জিনসে অন্যে হাত দিলে রেগে ওঠে। নিজের স্নেহের জায়গায় অন্যের উপস্থিতি মোটেই সহ্য করতে পারে না। শিশুর এই হিংসা বা স্বার্থপরতাকে সু-দৃষ্টান্ত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে না পারলে এটা তার জীবনে একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। অভিভাবক অভিভাবিকাদের এই সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা ভালো বীজ বপন করে তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করলে যেমন একটা মহীরুহতে পরিণত হয় তেমনি শিশুকে যত্নের সঙ্গে মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত

দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলেই তার মধ্যে একটা মহান্ জীবনের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে।

তিন বছর ঃ

শিশু তৃতীয় বছরে চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে পারে এবং নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে আশ্চর্য হয়ে যায়। ফুল, ফল, গন্ধ এবং রস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ওর অনুভূতি জাগে। শিশু ঘরে এবং বাইরে উভয় জায়গাতেই বিভিন্ন স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সে দেখে চারা গাছে পরিণত হচ্ছে। ফুল নানা রঙে নিজেকে বিকশিত করে তুলছে। বেড়াল ও বাড়ির কুকুরটা ডাক্‌ছে বা লাফাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে বা খাচ্ছে। কোনও কিছুই ওর দৃষ্টি এড়ায় না। সে দেখে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে আবার সুস্থ হয়ে উঠছে। দিনে সূর্য উঠছে, আবার রাত্রিতে চাঁদ উঠছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ আকাশে উড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার ওপর নানান ধরনের লোকের সঙ্গ পায় সে। কেউ তাকে আদর করে গাল টিপে দেয় আবার কেউ তাকে দেখতে পারে না। এই সময়ে শিশুকে নার্সারী স্কুলে দিলে সেখানে সে ওর মতই আরও ছোট ছোট ছেলে বা মেয়েকে আবিষ্কার করে। ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেল্‌তে শেখে এবং সেই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। সেখানে একটা নতুন পৃথিবীর সে সন্ধান পায়।

এই কারণেই শিশুর অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চলে। পৃথিবীকে আরও নতুন করে এবং বেশী করে জান্‌তে চায়। সে অনেকখানি সামাজিক হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারেই অন্যের সাহায্য চায় এবং অন্যের দরকারে নিজের সাহায্য দিতে চেষ্টা করে। সে ফেরিওয়ালা, কাগজওয়ালা, গয়লা এবং ডাক্তার প্রভৃতির হাবভাব অনুকরণ করে অভিনয় করতে খুব ভালোবাসে। শিশু যেখানে তার নতুন শেখা শব্দ ব্যবহার করার সুযোগ পায় সেখানেই তা করে অন্যকে তাক লাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

তার মনের মধ্যে এসে অনন্ত জিজ্ঞাসা নাড়া দেয়। সে জিজ্ঞাসা করে 'বৃষ্টি হয় কেন?' 'রাত্রি কেন কালো?' 'পাতা কেন সবুজ?' 'শিশু আসে কোথা থেকে?' —নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এই সময়টিতে মিষ্টি কথা দিয়ে তার কৌতূহলগুলির সমাধান করতে না পারলে ও স্বস্তি পায় না। যে করেই হোক্ কারো না কারো কাছ থেকে ওগুলির উত্তর আদায় করতে চেষ্টা করে। শিশুর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূরণ এবং কৌতূহল নিবারণের জন্য অভিভাবক অভিভাবিকাদের অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এ-সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে শিশুর 'মন' বিকাশ লাভের সুযোগ পায় না।

এই বয়সেই শিশু গল্প শুন্‌তে ভালোবাসে এবং গল্পের জন্য বড়দের কাছে উঠতে-বসতে আব্দার করে। গল্পের জন্য দিদিমা, ঠাকুমার সঙ্গে বিশেষ ভাব হয় এবং গল্প শুন্‌তে শুন্‌তেই ঘুমিয়ে পড়ে। শিশু নতুন গল্প শুন্‌লে খুব খুশি হয় এবং তা থেকে নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহ করে। সকলকে নতুন করে গল্পটা শোনাতে খুব ভালোবাসে। গল্প বলিয়েরা যদি এই সময়ে শিশু-মনের উপযোগী সুন্দর সুন্দর গল্প উপহার দিতে পারেন তবে তাঁরা তাদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং এ থেকে শিশু নিজের জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

চার বছর :

তিন বছর পর্যন্ত শিশুর জীবন বিশেষ কর্মচঞ্চল থাকে। এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত শিশুর জীবনকে 'কর্মী' এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে আর এই চার বছরের শিশুর জীবনকে বলা যেতে পারে 'দার্শনিক' জীবন। ধীরে ধীরে সে শৈশব থেকে বাল্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সে নিজে যা জানে তার থেকে বেশী বল্‌তে চায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শব্দ যোজনার চেষ্টা করে।

তৃতীয় বছরের চাইতে চতুর্থ বছরে সে বেশী দৌড়াতে পারে। উপর

থেকে নীচুতে লাফিয়ে পড়া ছাড়াও সে দৌড়ে এসে লাফাতে পারে। তার ভালো পোশাক পরতে এবং ভালো খাত্ত খেতে ইচ্ছা করে। নিজের জামার বোতাম এবং জুতোর ফিতে লাগাতে পারে। একটু একটু করে লেখা এবং পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বড় বড় গল্প শুন্‌তে ভালোবাসে এবং বলতে পারে। একটি কথার পুনরাবৃত্তি মোটেই পছন্দ করে না। নিজের ভূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই ভাবে না বরং বর্তমান নিয়ে চল্‌তে ভালোবাসে। গল্প বলার সময়ে অঙ্গের ভঙ্গিমা দিয়ে সমস্ত বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যের সেই রকম করাটাকে পছন্দ করে।

চার বছরের শিশু হিজিবিজি থেকে কিছুটা স্বাভাবিক আঁকায় অভ্যস্ত হয়। যদিও বড়দের কাছে এটা একটা প্রতিভার দিক বলে না-ও মনে হতে পারে, কিন্তু এ থেকে যে প্রায়ই তার শিল্পী জীবনের শুরু হয় তা সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরাই স্বীকার করে থাকেন। তাই আঁকার দিকে শিশুর ঝোঁক থাকলে তা দমিয়ে না দিয়ে সেদিকে তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেওয়াই হলো মা-বাবার একমাত্র কর্তব্য। এই সময়ে সে মানুষের মাথা অথবা শরীরের কোনও অংশ-বিশেষ আঁকতে পারে। অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের পোশাক পরতে অথবা ছাড়তে পারে। নিজের চুল আঁচড়াতে এবং নিজে দাঁত মাজতে শেখে। নিজেকে অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে খেলতে ভালোবাসে। ছোট বাচ্চাদের কাছে নিজে খুব বড় হয়ে গেছে এমন ভাব করতে চেষ্টা করে। শিশু নিজস্ব সম্পত্তি থেকে কিছু কিছু জিনিস দান করতে চায় তাদেরই—যাদের সে ভালোবাসে। নিজে ছাড়াও যে একটা সামাজিক জগৎ আছে, সেখানে সকলকে মিলে মিশে থাক্‌তে হয় সে কথা বুঝতে পারে এবং সে রকম ব্যবহার করতেও চেষ্টা করে।

পাঁচ বছর:

পাঁচ বছরে শিশু খানিকটা স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং শেষের দিকে শৈশবের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাল্যে প্রবেশ করে। নিজের ব্যক্তিত্ব এবং

স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠে। মেয়েরা মাকে গৃহকর্মে সাহায্য করতে চায়। অন্য শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করতে ভালোবাসে এবং অন্য কেউ খেলার সময় না থাকলে নিরুৎসাহ বোধ করে। নিজের একলা থাকার সময়টিতে দৌড়াদৌড়ি করে, ফল-ফুল তুলে, গাছের পাতা ছিঁড়ে এবং ছবি এঁকে পাতা ভরিয়ে ফেলতে চায়। নিজের কল্পনার কথা অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে বলে মা-বাবার তিরস্কারের পাত্র হয়। এই সময়ে সে নাচতে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালাতে চেষ্টা করে।

বাড়িতে শিশু এই সময়ে বেশীর ভাগই অন্যের উপর নির্ভর করে এবং বড়দের বাধ্য থাকে। অন্যের সঙ্গে এই সময়েই সে বিনয়ীর মতো ব্যবহার করে এবং সামাজিক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সে বাড়ির সকলের সঙ্গে শান্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার আশা করে এবং নিজে অন্যের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করতে চেষ্টা করে।

নিজে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাদের সকলের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে। বিশেষ কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে খেতে ভালোবাসে এবং এটা-ওটা গল্প বলতে ইচ্ছে করে। তার বাচন ভঙ্গিতে সে যে ছোট এটা প্রকাশ করতে মোটেই ইচ্ছে করে না এবং তাকে ছোট বলে অবহেলা করুক—এটাও সে কারো কাছ থেকে প্রত্যাশা করে না।

চার বছরের চাইতে পাঁচ বছরের শিশু অভিজ্ঞ ধরনের প্রশ্নতে অভ্যস্ত হয় এবং তার প্রশ্ন করার ভঙ্গিমাটা পাল্টায়। সে যা প্রশ্ন করে তার উত্তর পেতে চেষ্টা করে। তার প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ তার আশেপাশের বস্তু এবং সমস্যা নিয়েই গড়ে ওঠে। সে জানতে ইচ্ছা করে কোন জিনিসটা কিসের জন্য এবং তা দিয়ে কী কাজ হয়। সে বুঝতে চেষ্টা করে যে, বইটি পড়ার জন্য, ঘোড়াটি চড়ার জন্য, চামচেটি খাওয়ার সাহায্যের জন্য এবং টেলিফোনটি দূরে কথা বলার জন্য।

সে এই সময়ে একটি পূর্ণ মানুষের ছবি আঁকতে পারে। একটা

বিশেষ শব্দের অর্থ করতে পারে, বিশেষ বিশেষ খেলা মনে রাখতে পারে। কাগজ কেটে ছবি তৈরী এবং কোনও বিশেষ জিনিস তৈরী করতে ভালোবাসে। আঁকতে শুরু করার আগে কী আঁকবে তা ভেবে নিতে পারে।

পাঁচ বছরের শেষের দিকে শিশুর মন সময়-জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে। গল্পের আয়তন এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং গল্প বলার সময়ে সেই সমস্ত ঘটনা ঠিক মতো বিবৃত করতে পারে। আজ এবং কালের পার্থক্য সম্বন্ধে তার মনে ধারণা জন্মায়। এই সময়েই অভিভাবক এবং অভিভাবিকাদের কর্তব্য শিশুর মনে সমস্ত বিষয়ের একটা ধারণা চিত্রিত করা এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পারিচয় করিয়ে দেওয়া—যাতে করে সে ইস্কুল জীবনে প্রবেশ করে পদে পদে বিড়ম্বিত না হয় এবং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে জীবনকে সহজ করে তুলতে পারে।

ছয় বছর ঃ

শিশু পাঁচটি বছর পেরিয়ে পা দেয় এসে তার পঞ্চম বার্ষিকী জন্ম-দিনে। এই দিনটির পর থেকেই শুরু হয় তার ষষ্ঠ বর্ষে পদক্ষেপন। সে এক নতুন পরিবেশ এবং নতুন ভাবধারার মধ্যে এসে প্রবেশ করে। একটু একটু করে বাইরের জগতে বেড়িয়ে বেড়ায়। পৃথিবীর নতুন সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়। আশে পাশের ছোটদের সঙ্গে সে ভাব জমায়। এদিক-ওদিক তাদের সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠে।

নিজেই নিজের পোশাক পরে। অন্য কারো সাহায্য এ বিষয়ে আর তার নিতে হয় না; বরং কেউ তাকে সাহায্য করতে এলে সে বিশেষ অপমানিত বোধ করে। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করে এবং নিজের জিনিস নিজেই গুছিয়ে রাখে। এই সময়ে ছোটদের টাকা-পয়সা দিয়ে ছোট ছোট কম দামী জিনিস সওদা করতে

শেখানো উচিত। বেলুন, লজেন্স, পেন্সিল প্রভৃতি জিনিস তাকে দিয়ে কেনালেই এই ব্যাপারে তার জ্ঞান হতে পারে। কেনাকাটার বিশেষ অভ্যাসের মধ্য দিয়েই ছোটদের আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাস জন্মে।

যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অথবা পরিবেশের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, মা-বাবার উচিত এই সময়ে ঠিক সেই পরিবেশ অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন কাজ শেখানো। তার জীবনে নতুন কিছু শেখানোর সবচাইতে উপযোগী সময় হলো এই ছ' বছর। কাজ করার স্পৃহা এ সময়ে তার মনে না জাগালে এর পরে ওদের দিয়ে কাজ করানো খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তার ব্যক্তিত্বগঠন এবং দায়িত্ববোধ জাগাতে ছোট ছোট উদাহরণমূলক গল্প বিশেষ কার্যকরী হয়। আমাদের দেশের ছোটদের জন্য লেখা নীতিমূলক গল্পগুলো শিশুর মনকে বলিষ্ঠ এবং চরিত্রবান্ করে তোলে ।

এই বয়সেই দু'টি শিশু নিজেদের মধ্যে ভাব জমাতে চেষ্টা পায় এবং নিজেদের খেলাঘর গড়ে তোলে। শিশুরা বিভিন্ন প্রকৃতির এবং চরিত্রের হয়ে থাকে। কেউ খুব রাগী, কেউ লাজুক, কেউ আবার দুষ্টু বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। তার জীবনকে সুন্দরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই বয়সটিতেই মা-বাবাকে বিশেষ সচেতন হতে হয়। তা না হলে তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখকেই বরণ করে নিতে হয়। সকলের সঙ্গে কথা বলতে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে, বিশেষ করে সঙ্ঘ শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে এই ছোট্টবেলাতেই মা-বাবাকে চেষ্টা করতে হয়। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের লক্ষ্য রাখতে হয় এই সময়টিতে যেন শিশু নিজের খেলার সাথীদের নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসে এবং নিজেও যেন তার সাথীদের বাড়িতে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়।

শিশুরা যাতে এই সময়ে খেলাধুলোর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে সেদিকে বড়দের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। যদি ছোটাছুটি ও হুটোপাটিতে শিশুর একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় এবং দুষ্ট হয়ে পড়ে তবুও এর

বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাদের এই সময়ে 'লুকোচুরি', 'কুমীর-কুমীর', 'ভাই তুমি কোথা' ইত্যাদি খেলায় যোগ দিতে উৎসাহ দিয়ে ওদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই, তাদের মধ্যে দেখা দেবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিভা। মেয়েরা বিশেষ করে ঘর-সংসারের খেলা এই সময়ে বেশী পছন্দ করে। পুতুল খেলা এবং তাদের ঘর-সংসারের মধ্য দিয়েই নিজের ভবিষ্যৎ ঘর-সংসার করার কল্পনাকে সে গড়ে তোলে। ছোট ছোট রংএর খেলা অথবা ধাঁধার খেলা ছোটদের এই সময়টিতে বিশেষ কাজে লাগে। এছাড়া ছবি আঁকা, কাগজ কাটার কাজ ও অন্যান্য টুকিটাকি কাজে উৎসাহ পেলে এরাই একদিন বিখ্যাত শিল্পী হয়ে ওঠে।

সারাদিনের দুষ্টুমি আর হৈ-চৈ এর শেষে রাত্রিবেলায় ওরা যাতে বিশ্রাম পায় সেদিকে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। এর জন্যই সন্ধ্যাবেলায় ছোটদের কাছে মজার মজার রূপকথার গল্প বলে ওদের ঔৎসুক্য এবং কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে হয়। গল্প শুনতে শুনতে ওদের চোখে ঘুম আসে আর ওরা মায়ের বা ঠাকুরমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। সে এই সময়ে গল্প, ছড়া আর ছবিকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এবং সমস্ত কিছুরই একটা সরল মানে খুঁজে বেড়ায়। তাই ছোটদের কাছে গল্প বলার সময়ে মনে রাখতে হয় যেন গল্পের মধ্য দিয়েই ওদের মনের জিজ্ঞাসাগুলির কিছুটা সমাধান ওরা পেতে পারে। শিশুটিকে এইভাবে সুপথে চালনা করতে পারলেই অভিভাবক-অভিভাবিকাদের দায়িত্ব খানিকটা পালিত হলো বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন।

সাত বছর :

শিশু সাত বছরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা-বাবার জানা উচিত কি রকম মনোভাব নিয়ে সে গড়ে উঠছে। তার শিক্ষাধারা কী ধরনের হবে এর মধ্যেই মা বাবাকে তা ঠিক করে নিতে হবে। শিশুর চারধারের খবরা-

খবর, কী ধরনের ছেলে বা মেয়েদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে, পাড়া বা সমাজের পরিবেশ কী রকমের, তা জেনে নিয়ে বড়দের সমস্ত বিষয়ে সজাগ থেকে এই সময়ে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। বিশেষ করে নিজেদের জীবনযাত্রার সত্যিকারের ছবি তার সামনে তুলে ধরতে পারলে, এই সময়টিতে তার জীবন গড়ার পক্ষে যথেষ্ট কাজে আসে। শিশুর শরীরে কোনও কিছুর অভাব আছে কি না—তা এখনই যথাযথ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখার প্রয়োজন। যদি কারো কানের, অথবা চোখের, অথবা শরীরের অন্য কোনও কিছুর দোষ থাকে তা এই সময় থেকেই সু-চিকিৎসা দিয়ে দূর করার চেষ্টা করতে হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে এখন থেকে অগ্রসর না হলে ভবিষ্যতে অভিভাবকদের একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। শিশু-মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী এমন কারো কাছে তার বুদ্ধি বৃত্তির পরীক্ষা করে নেওয়া এসময়ে একান্ত আবশ্যক। শিশু স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা জড়বুদ্ধির কি না তা মনোবিজ্ঞানই বলে দিতে পারেন। মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেন, সে কোনও বিশেষ গুণের অধিকারী কিনা। তখন ঐ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু-মনোবিজ্ঞানের যে সমাদর দেখা যাচ্ছে তার কারণই হলো যে, এদিক থেকে অভিভাবক-অভিভাবিকারা বেশ ভালো ফল পেয়েছেন। মনোবিজ্ঞানের কাজই হলো শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা। আমাদের দেশের শিশু-শিক্ষা আজ যদি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শুরু হয়, তবে দেশের বিভিন্ন প্রতিভাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে, জাতীয়-শক্তি বাড়িয়ে তোলার কাজকে এগিয়ে দিতে পারা যাবে।

আট বছর ঃ

আট বছর বয়সে শিশু তার বাল্যের মধ্যরেখাটি অতিক্রম করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। দৌড়াদৌড়ি, সাইকেল চড়া. সাঁতার কাটা

দৈহিক পরিশ্রমের খেলাধুলোয় সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। নৌকা, এরোপ্লেন, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা এবং যে সমস্ত খেলায় বীরত্ব প্রকাশ পায়, সেই খেলাগুলো খেলতে ভালোবাসে। শারীরিক পরিবর্তনও এই সময় থেকেই শুরু হয়। দেহের পরিবর্তন গুলোতে শিশুর মনে বিস্ময় জাগে এবং সে খুব তাড়াতাড়ি বাবার মতো বড় হয়ে উঠ্‌তে চায়।

কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, সকলের সঙ্গে ব্যবহারে সে যে বড় হয়ে উঠছে তা দেখাতে চেষ্টা করে। নিজের খাবার নিজের হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে খেতে পারে এবং কোন একজনের ভঙ্গি নকল করে সমস্ত কাজ করে যেতে চেষ্টা করে। নিজের ইচ্ছায় পড়াশুনো করতে বসে এবং নতুন নতুন পড়া করতে খুব ভালোবাসে।

যতই শিশু বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দল বেঁধে খেলতে, কোথাও বেড়াতে যেতে ভালোবাসে। সামাজিক আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়টিতে শিশুকে যদি ভালো শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তা খুব কাজে আসে এবং তার ভাবী জীবন এই সুশিক্ষার প্রেরণাতেই গড়ে ওঠে। তবে সমস্ত শিক্ষা ধারার মধ্যেই যে নিজের স্বাধীনতা বজায় আছে তা বুঝতে না পারলে এ থেকে বিপরীত ফলও দেখা দিতে পারে।

নয় বছর :

শিশুর জীবনে আট বছর থেকে ন' বছরকে আলাদা করে দেখানো বড় কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ যে-সমস্ত পরিবর্তন তার আট বছরে আসে তার অনেকগুলোই ন' বছরেও দেখা যায়। তার এই সময়টিতে লেখাপড়ায় মন বসে এবং সকাল-সন্ধ্যে বড়রা না বললেও পড়তে বসতে অভ্যস্ত হয়। অনেক কঠিন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে চায় এবং সেগুলো মনে রাখতে চেষ্টা করে। কোনও কাজে মা-বাবা বাঁধা দিলে অবাধ্য হতে চায়। দেশ-বিদেশের খবরা-খবর, ইতিহাস এবং গল্প শুন্‌তে

ভালোবাসে। বিভিন্ন দেশের লোকেদের আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে গল্প শোনে মন দিয়ে। অভিভাবকেরা যদি এই সময়টিতে পড়াশুনো এবং গল্পের মধ্য দিয়ে ছোটদের কাছে বিভিন্ন দেশের গল্পের ঝুলি তুলে ধরেন, তবে শিশুরা বাইরের জগতের প্রতি চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং ইতিহাস আর ভূগোল পাঠ সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল হয়।

বাড়িতে ঠিক সময়ে পড়তে বস্‌তে অভ্যস্ত হলে শিশু স্কুলের শিক্ষায়ও এগিয়ে যায়। তবে দেখ্‌তে হবে শিশু যে স্থানটিতে বসে পড়ে—তা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী কিনা। উপযুক্ত পরিমাণ আলো, হাওয়া সেখানে আছে কিনা। তা না হলেই শিশুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং অকর্মণ্য হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

বড়দের সঙ্গে কথা-বার্তায় বড়দের মতো ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। শিশু ক্রমাগত কথা বল্‌তে ভালোবাসে। ওর কথা সকলে শুনুক এটাও সে খুব ইচ্ছে করে। শিশুর কথা বলার সময় কেউ যদি অমনোযোগী হয়ে পড়ে তবে তা শিশুর ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশু যাতে এই বয়সেই বুড়োটে না হয়ে পড়ে সেদিকে মা-বাবাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে এবং শিশুর সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হতে হয়।

শিশু রোজকার খবরের কাগজ পড়তে, বড়দের সঙ্গে সিনেমায় যেতে এবং বড়দের সমস্ত কাজে বড়দের মতো করেই যোগ দিতে চায়। এই সময়ে সিনেমার সাহায্যে শিশুর জীবনের আসল কথাগুলো এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তগুলো সাম্‌নে তুলে ধরতে পারলে খুব উপকার হয়। কথায় যে কাজ হয় না, চোখের সাম্‌নে ছবিতে তা তুলে ধরতে পারলে শিশুরা জীবনে তা থেকে সুফল লাভ করে থাকে।

শিশুকে এই সময়টিতেই কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা বুঝতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়—তা দৃষ্টান্ত দিয়ে সামনে তুলে ধরতে পারলে সে জীবনে আর আগুনে হাত দেয় না। অভিজ্ঞ অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাহায্যে শিশু এই বয়সেই জীবনের নিয়মগুলি, খেলার নিয়মের মতোই শিখ্‌তে পায়। সমস্ত

কিছুই শিশুর কাছে উপস্থিত করতে হয়—খেলার ছলে অথবা আনন্দের মাধ্যমে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: 'ন' বছরের একটি ছেলে নিজের কাজকে সমালোচনা করতে পারে। তা থেকে ভালো হবে, না খারাপ হবে তা বুঝতে পারে। শারীরিক শাস্তি অনেক সময়েই শিশুর চরিত্রের পরিবর্তন করে না বরং অভিভাবক-অভিভাবিকার প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে। শিশুকে 'এটা করো না', 'ওটা করো না'—না বলে, সুদৃষ্টান্তের দ্বারা—'এটা কর', 'ওটা কর'—বলা ভালো। সামাজিক ব্যবহার, ভদ্রতা-জ্ঞান এবং বিনয় শুধু শেখান যায় দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে। নিজে আচরণ করে নীতি শিক্ষা দেওয়ার মতো সুদৃষ্টান্ত ছাড়া বর্তমানকালে শিশু শিক্ষার আর কোনও ভাল পদ্ধতি থাকতে পারে না। এই ন' বছরটি যে শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় তা আমাদের চলতি বাঙ্গলা প্রবাদেই বলে: 'যার না হয় নয় বছরে—তার না হয় নব্বুই বছরে।'

দশ বছর:

দশ বছরের জীবনের পদক্ষেপেই শিশু তার বাল্যকে ছাড়িয়ে কৈশোরের দিকে এগিয়ে চলে। দেহের ও মনের অনেক পরিবর্তন দেখা যায় শিশুর মধ্যে। দৈহিক বিকাশ যে ঘটবেই—এ বড়দের কাছে জানা থাক্‌লেও ছোটদের কাছে এ একেবারে নতুন জিনিস। মাঝে মাঝে নিজের দেহের পরিবর্তনে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়ে। অনেক সময় বড় হওয়া সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং অন্যের কাছে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। মায়েদের এই সময় মেয়েদের বাড়ন্ত গড়ন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হয়, সুন্দর লম্বা এবং লাবণ্যযুক্ত চেহারা সৌন্দর্যের একটা প্রধান অঙ্গ। শৈশবে এবং বাল্যে ছেলেমেয়েদের গলার স্বরের বিশেষ কোনও তফাৎ থাকে না, কিন্তু দশের পর থেকে ছেলেদের গলার স্বরে পরিবর্তন দেখা দেয়। ছেলেদের

গলার স্বর কর্কশ বা শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। মেয়েদের গলার স্বর কিন্তু আগের মতোই মধুর থাকে। ছেলেরা এর ফলে লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং সহজে কারো সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এই সময়ে মেয়েদের আগত প্রায় যৌবনের চিহ্নগুলো ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে এবং গায়ের রং উজ্জ্বল হতে থাকে।

এই সময়ে হাতের কাজে ছেলেমেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ছেলেরা হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে ছোট-খাট পুতুল অথবা ফ্রেটের কাজ করতে ভালোবাসে আর মেয়েরা ভালোবাসে সেলাই করতে। রুমালে ফুলের ডিজাইন তুল্‌তে, পুতুলের পোশাক তৈরী করতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়েই মেয়েরা নিজেদের বাড়িটি গুছিয়ে রাখতে চায়। অন্যের কাছে নিজেদের ভালো ভালো জিনিসের গল্প করতে ভালোবাসে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলোয় এই সময় থেকেই এরা উৎসাহী হয়ে ওঠে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নানান ধরনের খেলাধুলো করতে এরা ভালোবাসে। নিজের মধ্যে জীবনের আদর্শ গড়ে তোলে এবং আদর্শে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করে। ভাবী জীবনে কে কী হবে তার কল্পনা গড়ে তোলে এবং তা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বল্‌তে ভালোবাসে। বাইরে বেড়াতে যেতে এবং বন্ধুদের সঙ্গে অভিযাত্রীতে যোগ দিতে চায়। ধাঁধার সমাধান, দুরূহ কথার সমাধান এবং ম্যাজিকের কায়দা-কানুনগুলো পছন্দ করে এবং নিজে নিজে তা অভ্যাস করতে চেষ্টা করে। ছেলেদের রোমাঞ্চকর গল্পের দিকে ঝোঁক পড়ে। মেয়েরা নিজেদের বই ছাড়াও ছেলেদের গল্পগুলো শুন্‌তে এবং পড়তে ভালোবাসে।

বিভিন্ন ক্লাব, অথবা প্রতিষ্ঠানে এই সময় ছেলেমেয়েরা প্রবেশ করতে চায় কারণ তাদের মন দলগত শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। দল বেঁধে কোনও কিছু করতে, শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নায়কের কথা পালন করতে এই সময়েই সে উৎসুক হয়। মা-বাবার কাছ থেকে এই ব্যাপারে বাধা পেলে তাঁদের কাছে দলের কথা লুকাতে চেষ্টা করে এবং মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এই সময়ে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন

ছেলেমেয়েরা তাঁদের ভয় না করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এর জন্য চাই ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং নিজেদের মধ্যে সত্য আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার অভ্যাস। মা-বাবা আদর্শস্থানীয় হতে পারলেই শিশুর জীবনে সব চাইতে কল্যাণ আনতে পারেন, এ-কথাটা অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মনে রাখা উচিত।

এগার বছর :

প্রত্যেক মানুষের এমন একটা বয়স আছে, যখন তাকে ঠিক শিশুও বলা চলে না, আবার পূর্ণ একটা মানুষও বলা যেতে পারে না। শিশুর এগার বছরটি হলো সেই বয়স। যখন শিশুরা দেহের দিক থেকে বয়স্ক মানুষের মতো হয়ে উঠতে শুরু করে। দশ বছর বয়স থেকে গলার স্বর পরিবর্তনের যে সূচনা দেখা দেয় তা এই বয়সেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'টীন এজ' এগার থেকে ষোল হলো সেই বয়স। দশ বছরের পর থেকে বিভিন্ন দিকে যে পরিবর্তন শিশুর মধ্যে দেখা যায় তা এই এগার বছরে পূর্ণতার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের বেলায় এই দৈহিক পরিবর্তন চলে ১১—১৬ বছর পর্যন্ত, আর মেয়েদের বেলায় এই পরিবর্তন শুরু হয় প্রায় ন' বছর থেকে এবং তা চলে পনের বছর পর্যন্ত। এই সমস্ত পরিবর্তন সকলের মধ্যে সমানভাবে হয় না—কারো আগে আবার কারো বা পরে পরিবর্তনগুলো দেখা দেয়। দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যাই এই সময় বেশী ছোটদের বিব্রত করে তোলে। এই পরিবর্তন বড়দের কাছে নতুন কিছু না হলেও ছোটদের কাছে এ এক অদ্ভুত। এই সময়েই ছেলেদের গোঁফের রেখা দেখা দেয় এবং চোয়ালের হাড় চওড়া হয়ে ওঠে। ছেলে এবং মেয়েদের মুখে দেখা দেয় ব্রণ। তাই নানান কারণে ওরা বিশেষ বিব্রত বোধ করে এবং নিজেদের সকলের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়। এর

ফলে শিশুরা লাজুক হয়ে ওঠে। বড়রা যদি এই সময়ে ওদের দেহের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর কথা বুঝিয়ে দেন তবে তারা এই লজ্জার হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এই সময়ে ছোটদের মধ্যে টিকিট সংগ্রহ, কুপন সংগ্রহ, বিভিন্ন দেশের টাকা পয়সা সংগ্রহ একটা খেয়ালের মধ্যে দাঁড়ায়। ছোটদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে এবং তার নিজস্ব একটা মত গড়ে ওঠে। অভিভাবক-অভিভাবিকারা যদি—এই সময়ে শিশু কোন পথে চলেছে—তা বুঝে তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করার সুযোগ না দিতে পারেন তবে অনেক প্রতিভা অকালে শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মা-বাবা যদি ছেলেমেয়েদের এই ব্যক্তিত্বকে উৎসাহ দিয়ে সুপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন তবে বেশীর ভাগ সময়েই সুফল দেখা দেয়। কৈশোরের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের *বুদ্ধিবৃত্তি বাড়তে থাকে; কিন্তু ১২ বছরের পর থেকে আবার তা* সাধারণতঃ কিছু কিছু কমতে দেখা যায়। এই সময় ছেলেমেয়েদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের খোঁজ-খবর রাখা, রীতিমত খবরের কাগজ পড়া, বিভিন্ন দেশের খেলাধুলো সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং রাজনৈতিক আলোচনা ছোটদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই বয়সটি হলো ছোটদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের যুগ। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মত্ত হয়ে এই সময়ে এরা পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে করে না এবং এর ফলে, পরিমিত বিশ্রামের অভাবে, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময় হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক দুর্বলতা এবং শারীরিক দুর্বলতা এসে সমস্ত জীবনকে ভর করে। এই কারণেই এই সময়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের যথাযথ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গীত, শিল্প, নাটক ও বিভিন্ন কাজে এই সময়েই ছেলেমেয়েরা উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের প্রতিভাকে বিকাশের চেষ্টা করে থাকে। ঠিক মতো উৎসাহ এবং শিক্ষা পেলে এটাকে এরা কাজে লাগাতে পারে।

এখন থেকে ছোটদের বিভিন্ন গুণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মানসিক বিকাশের কাজও শুরু হয়। দৈহিক বিকাশগুলো যেমন বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, মানসিক বিকাশ-গুলো বাইরে থেকে বুঝবার তেমন কোনও উপায় নেই। শুধু ওদের কথা-বার্তায়, চাল-চলনে এবং বুদ্ধির প্রশ্ন প্রভৃতিতে সেগুলোর প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই শিশুর মানসিক-শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উচিত ওদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে শিশুর প্রকৃত বয়স সাধারণতঃ অনেক সময় মানসিক বয়সের সমান হয় না। এগার বছরের শিশুকে হয়তো অনেক সময়ে নয় বছরের কম বয়স্ক শিশুর মানসিক বয়সের সমান দেখা যায়। তার মানে হলো, শিশুটি বয়সের তুলনায় প্রায় দু'বছর পিছিয়ে আছে। তাই তার সমান বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে *খেলাধুলো করতে বা মিশতে দিলে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই হয় বেশী।* অভিভাবক-অভিভাবিকারা এই সময়ে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে যদি ছোটদের কার্যসূচী তৈরী করে নেন তবে ভবিষ্যতে শিশুদের সত্যিকারের কল্যাণ দেখা দিতে পারে।

শৈশবে এবং বাল্যে যত কিছু কৌতূহল এবং আগ্রহ গড়ে ওঠে সবই শিশুর বাড়ি-ঘর-আপন জনকে নিয়ে। এই সময়ে শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক। 'আমার এটা', 'আমার ওটা'—এইভাব শিশুর মনে বেশী থাকে। এক কথায় বলা যায় ওরা থাকে তখন স্বার্থপর। কিন্তু কৈশোরে পা দিয়ে এই স্বভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। ওরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্ত কিছু ভালোমন্দ বিচার করতে চেষ্টা করে।

বারো বছর ঃ

ছোটরা এই বয়সে যৌবনের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে

যায়। যৌবনোচিত অনেক স্বভাব এই সময় থেকেই ছোটদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। তবে এটা ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় বেশী। নিজেদের কাজের ধারা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সমস্ত কাজ-কর্মে অন্যের প্রশংসার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। প্রশংসা না পেলে দমে যায় এবং হতাশ হয়ে পড়ে। মাথায় বড় হতে শুরু করে এবং দেহের নানান অংশের পরিবর্তন তখনও চলতে থাকে। তবে এটা সকলের সমানভাবে হয় না। কেউ বয়সের চাইতে বেঁটে থেকে যায় অথবা রোগা হয়, কেউবা বেশী লম্বা এবং মোটা হয়ে পড়ে। ওদের এই সময়ে বয়সের ধর্মগুলো বুঝিয়ে দিতে না পারলে কুসংসর্গে পড়ে খারাপের দিকে এগিয়ে যায় এবং ভাবী জীবনে এরা সমাজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। নিজেরা স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখে এবং ওদের কাজে-কর্মে বিশেষ স্বাধীনতা চায় এবং বড়দের কাছে বাধা পেলে দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। মা-বাবাকে মনে রাখতে হবে, এই সময়টিতে তাঁরা যদি তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন, তবে পরের জীবনে তাঁদের দুঃখকে বরণ করে নিতেই হবে। বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে ন্যায় এবং অন্যায়গুলো বন্ধুভাবে ছোটদের কাছে উপস্থিত করলেই এই সময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যেতে পারে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। কিশোর মনের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজে অগ্রসর হলেই অভিভাবক-অভিভাবিকারা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবেন বলে মনে হয়। ছোটরা এই সময়ে কারো না কারো প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নিজেদের সামনে কাউকে না কাউকে আদর্শ হিসেবে রাখে এবং সেই আদর্শকেই হুবহু নকল করতে চেষ্টা করে। আচার, ব্যবহার, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদেও এই নকলের ধারা অব্যাহত থাকে। বড়দের জগতের দিকে এগিয়ে যেতে চায় এবং চাল-চলন—বড়দের মতো করে তোলে। ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রতি কৃপা জাগে এবং ওরা যে অনেক ছোট এটা সমস্ত কথা-বার্তায় বোঝাতে চেষ্টা করে।

ছেলে-মেয়েরা পরস্পর নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যৌন আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চায়। ছেলেমেয়ের অঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে অসাদৃশ্যই আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনোতে অমনোযোগী হয়ে উঠতে থাকে। পড়ার বইয়ের চাইতে বাইরের বই বেশী পড়তে ভালোবাসে এবং বাইরের জগতের খবরাখবর কিছু কিছু রাখতে চায়। 'কে বেশী জানে'—এই নিয়ে বেশীর ভাগ সময়েই বন্ধুদের মধ্যে তর্কের অবতারণা করে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিজেদের মনে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে থাকে। সমাজে সকলের সাথে শিশু-দের কিভাবে চলা উচিত—তার একটা হাতেখড়ি এই বয়সে না পেলে শিশুর অসামাজিক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এতদিন ঘরের সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ ছিল সারল্যের, স্নেহের এবং আদরের। কিন্তু এখন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উচিত এই স্নেহময় পরনির্ভরতা থেকে শিশুকে ধীরে ধীরে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর জগত ও সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এ না করতে পারলে শিশু জীবনপথের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা পায় এবং ঘরকুণো হয়ে পড়ে। শিশুর মনটা হলো একতাল কাদার মতো। এর পরেই শক্ত হতে শুরু করে। তাই এই সময়টিই হলো যথোপযুক্ত সময় যখন উপযুক্ত অভিভাবক অথবা শিক্ষকের হাতে পড়ে সমাজের কল্যাণে সে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে। শিশুর মধ্যে একটা অপরাধ প্রবণতা এই সময় থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। তাকে সুপথে পরিচালিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে সে সমাজের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। অনুকরণপ্রিয়তাই শিশুকে অপরাধ প্রবণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কু-পরিবেশ থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে স্নেহপ্রবণ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কাছে রাখলে শিশুকালে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

তের বছর ঃ

বারো বছরে শিশুর ভেতরে এবং বাইরে যে সমস্ত পরিবর্তন চল্‌তে থাকে তা তের বছরেও অব্যাহত থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং একটু ফিটফাট থাকার দিকে শিশু ঝুঁকে পড়ে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে, গল্প-গুজব করতে ভালোবাসে। সাধারণতঃ সঙ্ঘ, ক্লাব প্রভৃতির বেশী পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। একটা বিশেষ পরিকল্পিত কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। এই কারণেই শিশুদের বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড, সব পেয়েছির আসর, মণিমেলা প্রভৃতি বিশেষ আদরের এবং আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নিজের ঘরে কাজকর্ম থেকে এই সময়ে বাইরের জগৎ এবং ঐ সংক্রান্ত কাজকর্ম ভালো লাগে বেশী। ছোটদের বিভিন্ন সংস্থার মধ্য দিয়ে তারা তাদের মনের এই অভাবটিকে পুরণ করতে পারে বলেই তারা এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অভিভাবক-অভিভাবিকারা অনেক সময়ে ভুল বুঝে এতে বাধা দেন, তার ফলে বড়দের এবং ছোটদের মধ্যে অভিমান এবং ভয়ের এক বিরাট প্রাচীর গড়ে ওঠে। মা-বাবার ভালবাসা শিশু তখন গ্রহণ করতে পারে না, ফলে সব ব্যাপারেই তার সন্দেহ জাগে। ভালবাসাকে শিশু শাসন মনে করে বড়দের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। ভাল কথা বললেও সে মন্দ বলে মনে করে এবং আত্ম-রক্ষার জন্য নানান রকম ফন্দী আটতে চেষ্টা করে। নানা রকম মিথ্যার বেসাতির মধ্যে দিয়ে ছোট্ট জীবনটিকে কোনও রকমে এগিয়ে নিয়ে চলে। এর ফলেই শিশু ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

এই সময়ে শিশুদের মধ্যে ছয় রকমের অপরাধ প্রবণতা দেখা যায়। যেমন ঃ (১) সহজ ধরনের অপরাধ প্রবণতা, (২) স্বভাবগত অপরাধ প্রবণতা, (৩) সরল অপরাধ প্রবণতা, (৪) প্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধ প্রবণতা, (৫) মৃগীরোগজনিত অপরাধ প্রবণতা এবং (৬) স্বল্পবুদ্ধিজনিত অপরাধ প্রবণতা। আজকাল খেলার ছলে, পড়ানোর যে নতুন পদ্ধতি অবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েই শিশুদের মনের মধ্যে ধ্বংস করার যে সহজ

প্রবৃত্তি তা দূর হয়ে যায় ও ফলে ওরা স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা থেকে নিজেকে সাম্‌লে উঠতে পারে। মনো-বিজ্ঞানীরা অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে বলেছেন, কিন্তু সমস্ত অপরাধপ্রবণতাই দূর হতে পারে যদি অভিভাবক-অভিভাবিকারা শিশুর মনটিকে বুঝে নিয়ে বয়সের উপযোগী যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারেন। যৌন অপরাধও এই সময়ে ছোটদের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে। ছেলেদের কাছে এই সময়ে বাবার এবং মেয়েদের কাছে মায়ের এই পরিবর্তনের রহস্য এবং যৌন-বিজ্ঞানের সাধারণ কথাগুলো সহজ করে বুঝিয়ে দিতে হয়। তাতে শিশুদের খুব উপকার হয়।

এরাও নিজেদের দেহতত্ত্বকে বুঝে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সহজ পথে। আর তা না হলেই এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব বিকৃতরূপ নেয় এবং বিকৃত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ওরা নিজেদের এবং সমাজের অকল্যাণই করে বসে। শিশুকে মানুষ করে তুল্‌তে হলে বড়দের এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই এই বয়স থেকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

চৌদ্দ বছর ঃ

চৌদ্দ বছর বয়সে শিশু একটু স্বাতন্ত্র্য প্রিয় হয়ে ওঠে। নিজে একা থাকতে, একা পড়তে এবং নিজের একার জন্য সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। তাই নিজের ড্রয়ারটি বা আলমারিটি তালা দিয়ে রাখতে চায়। নিজের কথাগুলি লিখে রাখতে রোজনামচার শুরু করে। সব কিছুতেই একটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে ভালোবাসে। শিশুর ব্যক্তিত্বও এই সময়ে একটা বিশেষ রূপ নেয়। যৌবনের বিশেষ লক্ষণগুলো দেহে এবং মনে প্রকাশ পেতে থাকে। মা-বাবারা যদি সাংসারিক কোনও কথা শিশুকে জিজ্ঞাসা করেন তবে খুব খুশি হয়। সংসারে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ওর চাইতে যারা ছোট তাদের

সব সময় 'এটা কর্‌' 'ওটা কর্‌' উপদেশ দিতে চেষ্টা করে। এতে মা-বাবার মৌনসম্মতি আছে জান্‌লে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করে এবং আশে-পাশে, পৃথিবীর চারিদিকে তাকিয়ে সমস্ত কিছু বুঝতে শুরু করে। 'দিবা স্বপ্নে' অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শৈশব এবং বাল্যে যা ছিল শুধু তার রাতের স্বপ্ন, এখন তা 'দিবাস্বপ্নের' মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নিজের আদর্শ এবং ধারণা সম্বন্ধে সজাগ হয়। সমাজে এবং পরিবারে যে তার একটা বিশেষ স্থান আছে সে সম্বন্ধে ভাবতে শেখে। তাই পরিবারের অবহেলা পেলে দুঃখিত হয়।

অভিভাবকদের অনেক সময় এই সময়টিতেই ত্রুটি বিচ্যুত ঘটে। অনেকে ভাবেন, ছেলে বা মেয়ে বেয়াড়া হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং একে শাসন করা দরকার। এর ফলে কড়া শাসন শুরু হয় এবং কিশোর মনে এর প্রতিক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায়। অন্য আর একদল অভিভাবক মনে করেন, ছেলে বা মেয়েকে কিছুই বলবেন না—'যদি গোল্লায় যেতে চায় তবে গোল্লায়ই যাক্‌'। দুই-ই চরম পন্থা এবং এই দুই পন্থাই শিশুর অবনতির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এক শ্রেণীর অভিভাবক আছেন যাঁরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বন্ধুভাবে মিশতে চান, কিন্তু এতেও তাঁদের হতাশ হতে হয়। ক্রমে মনে হয় তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে অভিভাবকদের মনে রাখা উচিত যে তাঁরা যতই আধুনিক হন না কেন, তাঁরা অভিভাবকই থেকে যান এবং অনেক সময়েই কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্‌তে পারেন না। এ-ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়ে। তার ফলেই ছোটরা তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তবে নিজের ব্যক্তিত্বটি বজায় রেখে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমস্ত কিছু খোলাখুলি আলোচনা করে তাদের মনের মতো করে বল্‌তে পারলেই সুফল দেখা দেয় এবং অভিভাবক-অভিভাবিকরা হয়ে ওঠেন শিশুদের কাছে প্রিয়।

পনের বছর ঃ

যৌবন এগিয়ে আসে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পনের এবং যোল বছর যৌবনের প্রথম দিক বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস আত্মজীবনী, বীরত্ব-গাথা প্রভৃতি বই পড়তে ছোটরা এই সময়ে বেশী ভালোবাসে। সাহিত্যসভা, বিতর্কসভা, নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতির দিকেও ছোটরা এই সময়ে খুব আকৃষ্ট হয়। কিশোর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছোটদের এগুলোর খানিকটা স্পৃহাও মেটে।

নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার আগ্রহ জন্মে। সাহিত্যে, অঙ্কনে, জিনিস তৈরীর মধ্য দিয়ে তাদের এই আগ্রহের সমাধান করে। এই বয়সটিতে তার সৃষ্টির ইচ্ছার বিকাশ যদি ঘটাতে পারে, তবেই সে উত্তরকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য এবং শরীর চর্চার দিকে ছেলেরা মন দেয় আর মেয়েদের সৌন্দর্য চর্চা শুরু হয় এই বয়স থেকেই। মেয়েদের এই সময়ে যাতে সু-রুচিবোধ জাগে সেদিকে মায়েদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। তা না হলে কুরুচিপূর্ণ আচার-ব্যবহার হাব-ভাব এবং পোশাক-পরিচ্ছদে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিশোর জীবনের বিশেষ অবস্থার বিভিন্ন আদর্শগুলো, এই সময়ে ছোটদের মধ্যে তুলে ধরতে পারলে, তা থেকেই ওরা শিক্ষা গ্রহণ করে। এই সময়ে কোনও না কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ছেলে বা মেয়েরা শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে। তিনিই পারেন শিশুর ব্যক্তিত্বকে একটি সুন্দর দিকে প্রবাহিত করতে। এই সময়ে কিশোরদের মধ্যে যৌনসমস্যা দেখা দেয় এবং তা যদি সুষ্ঠুরূপে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবেই তাদের এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সকলের মনে রাখা উচিত, নর-নারীর জীবনে যৌন-জ্ঞানের বিকাশ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিকাশের মতোই প্রয়োজনীয়। আর বড়দের উচিত সমাজ জীবনের স্থিতি এবং নিরাপত্তার জন্য নরনারীদের মধ্যে যে যৌনবন্ধন বিশেষ দরকার তার একটি পবিত্র ছবি কিশোর মনে তুলে ধরে—তার সঙ্গে

তাদের পরিচয় সহজ করিয়ে দেওয়া। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সহজ এবং সুস্থ মেলামেশার অবকাশ দিয়ে কর্মময় এবং আনন্দময় জীবনের সূচনা করতে পারলেই এই সময়ে এটা একটা রক্ষা কবচ হিসেবে দেখা দেয়।

ষোল বছর :

ষোল বছর বয়সকে বলা যেতে পারে কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণ। এই বয়সটিতে ছেলেমেয়েরা কৈশোরত্বের চাইতে যৌবনত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশী। দৌড়, ঝাঁপ, ফুটবল, বক্সিং, হা-ডু-ডু, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার দিকে ছেলেরা মন দেয় আর মেয়েরা মন দেয় মায়েদের সাহায্য করার কাজে। শিবির জীবন, ভ্রমণ, হাতের কাজ প্রভৃতিতে এই বয়সে কিশোররা আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হতে চায়। হাসির গল্প এবং রোমাঞ্চকর গল্প পড়তে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং অনেকেই বড়দের লুকিয়ে যৌনতত্ত্বমূলক বই পড়ার দিকে মন দেয়।

যৌবনের প্রারম্ভে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উচিত যাতে কিশোর-কিশোরীটিকে সুস্থ, সবল এবং সাহসী যুবক এবং যুবতীতে পরিণত করে তুলতে পারেন। এর জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে চাই তাদের জন্য : (১) সুস্থ সবল কিশোর মনের উপযোগী সংগঠন, (২) কিশোর মনের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার, (৩) উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কেন্দ্র, (৪) কিশোর মন এবং স্বাস্থ্যের উপযোগী খেলাধুলো এবং (৫) কিশোর প্রতিভা বিকাশের জন্য নতুন ধরনের প্রতিযোগিতা।

শিশুর ষোলটি বছর বিশেষ আলোচনা করে নিয়ে, সমস্ত কিছু মনে রেখে তাকে মানুষ করার ব্রতে এগিয়ে গেলেই আজকের দিনে অভিভাবক-অভিভাবিকারা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবেন বলে বর্তমান কালের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শিশু শিক্ষার গোড়ার কথা

শিশু নিজের পরিবার, মা-বাবা এবং যে ধরনের শিক্ষাধারা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে, তা অনুধাবন করলেই ভাবী জীবনে তার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যেতে পারে। শিশু কিভাবে বড় হয়?—কিভাবে তার মানসিক অগ্রগতি সম্বন্ধে বোঝা যেতে পারে?—কিভাবে তাকে দায়িত্বজ্ঞান, নম্রতা এবং ভদ্রতা শেখানো যেতে পারে?—এই ধরনের বহু প্রশ্ন অভিভাবকদের কাছ থেকে মনোবিজ্ঞানীরা হামেশাই পেয়ে থাকেন। এর উত্তরে মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, একটা মহৎ জীবন পৃথিবীতে কখনও হঠাৎ জন্ম নেয় না। মা-বাবার বহু যত্ন, সাধনা এবং সুসংযত শিক্ষাধারার অনুসরণের ফলেই ছোট শিশুর মধ্যে মহান সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। শিশুর চরিত্রের গঠন একমাত্র মা-বাবার কাছে বাড়িতেই হতে পারে। দেহের অথবা মনের বৃদ্ধি মানেই হলো পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমান তালে যে মা-বাবা চলতে পারেন, তিনিই সত্যিকারের শিশুকে মানুষ ক'রে গড়ার কাজে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন। তাই শিশুদের মনকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীদের প্রধানতম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ধীরে ধীরে তার মা-বাবার প্রতিভার স্পর্শেই হয়ে থাকে। তাই অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এই সময়ে খুব সাবধানে সংযত আচরণের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। শিশু শিক্ষার প্রধান হিসাবে—'আপনি আচরি ধর্ম শিশুরে

শিখাইবে'—যদি মা-বাবা গ্রহণ করতে পারেন, তবেই তাঁদের সাধনার সু-ফল একদিন দেখা দিতে পারে। বড়রা যা করেন না—শুধু শিশুকে শেখানোর জন্য মুখে বলে তাকে সেই কথা মানানো বা করানো মোটেই সম্ভব নয়। সাময়িকভাবে এতে কাজ হলেও কালে এটা কুফল হিসাবেই দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে অনুকরণপ্রিয়তা যেখানে শিশুদের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে মা-বাবার পরস্পরের অসংযত ব্যবহার, বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে রুক্ষ আচরণ শিশুর মনে তাঁদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে থাকে।

এই ঘৃণাই আবার উত্তরজীবনে শিশুকে সংক্রামিত করে তার জীবনকে বিষময় করে তোলে। এ-ছাড়া ছোটদের সামনে পাড়াপ্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা, অভদ্র ব্যবহার এবং বাড়িতে চাকরবাকরদের প্রতি অবহেলা ছোটদের ভাবীজীবনকে অসংযত এবং অভদ্র করে তুলতেই সাহায্য করে থাকে। তাই তো বলি 'শিশুর শিক্ষা আমার কাছে।' মা-বাবা যে-সমস্ত উদাহরণ শিশুর চোখের সামনে তুলে ধরেন, তার চাইতে কী ভালো তাঁরা আশা করতে পারেন? জোর করে শিশুকে কিছু করতে বাধ্য করানো অথবা জোর করে কোনও বিশেষ আদর্শকে তার জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করলে তা থেকে সুফল পাওয়ার চাইতে কুফল পাবার সম্ভাবনাই বেশী। সুন্দর ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে শিশুর চোখের সামনে আদর্শগুলো তুলে ধরতে পারলেই তার ভালো জিনিসটুকু সে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তাই শিশুর মানসিক অগ্রগতির পথে মা-বাবা নিজেদের মিথ্যা আচরণ এবং অহঙ্কারকে বিসর্জন দিয়ে সত্যের পথে ছোটদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই অভিভাবকদের কর্তব্য কর্মে অর্থাৎ শিশু গড়ার কাজে সাহায্য করলেন বলে ধরা যেতে পারে।

বয়ঃক্রম অনুসারে শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ডঃ আর্নোল্ড গেসেল (Dr. Arnold Gesell) বলেন: 'শিশুর মানসিক শক্তি বিকাশ লাভ করে ধীরে পর্যায়ক্রমে।' স্বাভাবিক উপায়ে শিশুর শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই শিশু

দাঁড়াবার আগে বসতে শেখে, কথা বলার আগেই 'কল্‌কলানি'তে ভরিয়ে তোলে এবং বর্গক্ষেত্র আঁকার আগেই বৃত্ত আঁকতে শেখে। প্রথমে শিশু পরের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং পরে আস্তে আস্তে নিজের উপর নির্ভর করতে শেখে। তার মানসিক বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ করতে পারলেই ভালো ফল দেয়। তাই তাকে জোর করে কিছু শেখানোর চাইতে তার মানসিক বৃত্তিগুলো সুপথে পরিচালিত করাই হলো মা-বাবার প্রকৃত কর্তব্য। ডাঃ আর্নোল্ড গেসেল ও তাঁর সহকর্মীরা Yale Universityর বিখ্যাত পরীক্ষাগারে হাজার হাজার শিশুদের মানসিক বৃত্তিগুলোর বিকাশধারা সম্বন্ধে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে, প্রথম দশটি বছরই শিশুদের জীবনপথের সন্ধান দিয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রথম পাঁচ বছরে শিশুরা হাঁটতে, বেড়াতে ও খেতে শেখে। তিন থেকে ছয় বছর বয়সে তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠে। এই সময়েই ওরা অভিভাবকদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করে; তাদের কল্পনাশক্তির প্রখরতা বাড়ে ও সব সময় একটা কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। ছয় থেকে নয় বছরে শিশুরা অল্পবিস্তর নিয়ম মেনে চলতে পারে। মা-বাবা ও অন্যান্য সকলের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। ত্রিশ-বত্রিশ মিনিট মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করতে পারে। চার-পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গে খেলতে পারে। তবে মিলেমিশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে খেলতে চায় না বা ভালোবাসে না। কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। নয় থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলতে শেখে। মেয়েরা মা'র কাজ অনুসরণ করে খেলতে ভালোবাসে ও মায়ের কাজে সাহায্য করে থাকে। সঙ্গীদের সঙ্গে যৌন বিষয়ক কথা বলে। বিশেষ করে এই সময়ে বড়দের সঙ্গে ব্যবহার এবং সামাজিক শিক্ষাধারার সঙ্গে ছোটদের মনের যোগাযোগ ঘটে থাকে।

এই সময় বিশেষ সাবধানের সঙ্গে সু-দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলে এদের মধ্য থেকেই সু-নাগরিক আশা করা যায়। এই সময়ে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা, অন্যের প্রতি আদেশ ও অনুরোধ,

মৃত্যু এবং রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা শিশুদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে থাকে। মা-বাবা যে আচরণ তাদের সামনে তুলে ধরেন, ঠিক সেই ধরনের আচরণই পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে আশা করতে পারেন।

মা-বাবার ভোরে ওঠার অভ্যাস, গুরুজনদের প্রতি বিনয়নম্র ব্যবহার নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলি শিশুদের মনে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে ও সেই রকম দৈনন্দিন ব্যবহারে সেও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। বেশীর ভাগ মা-বাবা ছোটদের স্কুলে পাঠান একটু শান্তিতে দুপুরটি কাটানোর জন্য,—একথা তাঁদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। অথচ স্কুলে পাঠিয়ে তাদের মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলোর কতটুকু উপকার হয়েছে তার খোঁজ নেন ক'জন অভিভাবক বা অভিভাবিকা? অভিভাবকদের কাছ থেকে এমন কথাও শোনা যায় যে, 'আমার ছেলে—এই —এই ক্লাস ফাইভ কি ফোরে পড়ছে—।' অর্থাৎ কোন্ ক্লাসে পড়ছে সে খোঁজটুকুও তাঁরা রাখতে সময় পান না অথবা রাখতে ইচ্ছা করেন না। এই সমস্ত অবহেলিত শিশুদের কাছ থেকে দেশ কতটুকু আশা করতে পারে? বিদেশে যে সময়ে মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ভাবছেন —'ছোটদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষ করা যায় কী উপায়ে?'—ঠিক এই সময়ে আমাদের অভিভাবকেরা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েই তাঁদের দায় এবং দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। শিশুপালন যে একটি নিদারুণ সমস্যা, সে কথাটি বুঝেও তাঁরা বুঝতে চান না। যাঁরা একটু বোঝেন তাঁরাও এড়িয়ে যেতে চান টাকা-পয়সা অভাবের নজির দেখিয়ে। বিশেষ করে সমস্ত দেশে ও সমস্ত কালেই শিশু গড়ার দায়িত্ব অভিভাবক ও শিক্ষকদের। বিচার-বুদ্ধিকে সামনে রেখে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুপালনের পথে অগ্রসর হলেই আমাদের জাতীয় জীবনে সু-দিন ফিরে আসতে পারে—একথাটা আজ জোর করেই বলা চলে। প্রত্যেক মা-বাবাই শিশুর জন্য তাঁদের মনের মণিকোঠায় ততটুকু ভালোবাসা ও স্নেহই সঞ্চিত করে রাখবেন, যতটুকু না হলে তার পক্ষে জীবনপথে এগিয়ে

যাওয়া সম্ভব নয়। মা যে মাত্র গৃহকর্ত্রী, রাঁধুনি অথবা সেবিকাই নন, বাবা যে কেবল আশ্রয়দাতা, খাবার বা অর্থের যোগানদারই নন, এর ওপরে তাঁরা শিক্ষক, গুরু এবং বন্ধু—সেই আদর্শটিই শিশুর জীবনে প্রতিফলিত করে তুলতে হবে।

শিশুর মানসিক ও শারীরিক অগ্রগতির জন্য স্কুল ও শিশু-সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিশেষ শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে নার্সারী স্কুলগুলি শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাগুলির বিকাশ করার চেষ্টা করে আসছে। শিশু-মনে কোনও শিক্ষাই যাতে গুরুভার হিসাবে দেখা না দেয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই নার্সারী স্কুলের বিষয় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সেখানেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়ে ছোটদের গড়ার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছেন। সমষ্টিগত আচরণের অভ্যাস, মিলে মিশে কাজ করে প্রতিভার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন দেশ-বিদেশে বয়েজ স্কাউট, গার্লস্ গাইড, ফোর এইচ্ ক্লাব, ব্রতচারী সমিতি, সব পেয়েছির আসর এবং মণিমেলা সংগঠন প্রভৃতি। তাই সমস্ত সঙ্ঘ ও সংগঠন সম্বন্ধে সঠিক খবর ও ধারণা রাখার ব্যাপারে অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষকদের দায়িত্বও বড় কম নয়।

সমস্ত সময়ে মনে রাখতে হবে শিশুকে মানুষ করার ও দশ-জনের একজন করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব প্রধানতঃ শিশুর মা-বাবার। এর জন্য চাই অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা। বিশেষ করে মা-বাবার শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ছোটদের মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্নও এগিয়ে চলেছে তালে তালে পা ফেলে।

শিশুর লেখাপড়া

লেখাপড়ার ব্যাপারে দেখা যায় যে, সব শিশুর পক্ষেই সমান ভাবে সমস্ত বিষয়গুলি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কোন কোনও শিশু অতি অল্প সময়েই তার পড়া সুন্দরভাবে শিখে নিতে পারে—আবার কারও পক্ষে অত তাড়াতাড়িতে শেখা সম্ভব হয় না। এর ফলে দেখা যায় একই শ্রেণীর বিশেষ একটি শিশু অন্যান্যদের চাইতে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ছে। স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ঐ পিছিয়ে পড়া শিশুর জন্য মোটেই অপেক্ষা করেন না। ফলে সমবয়স্ক শিশুদের পড়াগুলো তার কাছে ক্রমে দুর্বোধ্য বলে মনে হতে থাকে। অবশ্য স্কুলে অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষিকারাই শিশুর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করে নিয়ে—তার পড়াশুনোর ব্যাপারে একটি সুন্দর সূচনা করে দিতে পারেন। বিশেষ করে লেখাপড়ার দিকে আকর্ষণ, মনোযোগ ও বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার ধারা অনেক সময়ই পিছিয়ে পড়া শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শিশুদের লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ার কারণ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন—তাতে দেখা যায় যে প্রায় ষাটটি কারণে শিশু লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়তে পারে। এই সমস্ত কারণগুলোর মধ্যে কতকগুলো হলো দৈহিক, মানসিক এবং কতগুলো হলো তার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও তার পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে বহুলাংশে দায়ী করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা $\frac{1}{8}$ অংশ শিশুকে দৈহিক অপটুতা, $\frac{1}{6}$ অংশকে তার সামাজিক অবস্থার জন্য, $\frac{1}{3}$ অংশকে

প্রকৃতগত দোষের জন্য, ⅓ অংশকে বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতার জন্য এবং ⅓ অংশকে বিদ্যালয়ের অব্যবস্থার জন্য লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে বলে মনে করেন।

স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে অবশ্য সবাই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে না। কেউ হয়তো বিজ্ঞান, কেউ গণিত, কেউ ইতিহাস, কেউ সাহিত্য, কেউ বিদেশী ভাষা, কেউ ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী হতে চায়। এইভাবে একটি বিশেষ বিষয়ে শিশু আগ্রহশীল হয়ে ওঠে এবং উত্তর জীবনে নিজের শিক্ষাধারাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে।

শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে একটা তারতম্য দেখা যায়। কারণ একই ধরনের শিক্ষার মধ্যে সকলে সমান রস গ্রহণ করতে পারে না। শিশুর শিক্ষা-ধারাটা বুঝে নিয়ে, তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে—অনেক সময় সুফল দেখা দেয়। শিশু শিক্ষার ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক সীমারেখা সমস্ত সময়ই নির্দিষ্ট থাকে এবং ঐ সীমারেখাকে ডিঙিয়ে যাওয়া কোনও প্রতিভাবান শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না।

শিশুর অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ওর হাতের লেখাও সুন্দর হয়ে উঠ্‌তে পারে সে দিকে ছোটবেলা থেকেই অভিভাবক এবং শিক্ষকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিশু যে শিক্ষকের কাছে থেকে প্রথম লেখার হাতেখড়ি নেয়—তার লেখাকেই সে জীবনভর অনুসরণ করে চলে। এই ব্যাপারে যাতে তার 'লেখা' সুন্দর এবং নিখুঁত হতে পারে—তার জন্য অভিভাবক এবং অভিভাবিকাদের সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়। আজকের যান্ত্রিক যুগে যেমন বিদেশে টাইপরাইটার মেশিন হাতের লেখার স্থান অধিকার করেছে—তেমনি আমাদের দেশেও একদিন বাংলা টাইপরাইটার আমাদের হাতের লেখার স্থান অধিকার করবে বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু যতদিন তা না হয়—ততদিন যাতে উত্তর জীবনে শিশুর হাতের লেখা অন্যের পীড়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়—সেদিকে বড়দের অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেক সময় সুন্দর হাতের লেখাকে কেন্দ্র করেই শিশুর মধ্যে শিল্পী মনের সূচনা দেখা দেয়,—একথা সমস্ত শিশু কল্যাণকামীদেরই

মনে রাখা দরকার। মনোবিজ্ঞানীরা হাতের লেখাকে ভাষার এবং কথার ছবি বলে মনে করে থাকেন।

লেখাপড়ায় ভালো ফল দেখানোর ব্যাপারে শিশুদের যাঁরা সাহায্য করতে চান এবং যাঁরা সমস্ত সময়েই ভাবেন—আজকের দিনে শিশুর লেখাপড়ার মান বা standard কি করে বাড়িয়ে তোলা যায়,—তাঁদের সুবিধার জন্যই মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করছি।

কথাগুলো হলো ঃ

(১) শিশু যাতে শারীরিক সুস্থ থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।

(২) তার লেখাপড়ার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে দেওয়া।

(৩) নিয়মিত একই সময়ে যাতে পড়া আরম্ভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

(৪) মন দিয়ে যাতে নিয়মিত পড়া অভ্যাস করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(৫) নতুন বিষয় শুরু করার আগে যাতে পুরোন পড়াটি আর একবার আলোচনা করে নেয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(৬) দুর্বল বিষয়টি বারে বারে অভ্যাস করার ব্যবস্থা করা।

(৭) কবিতা অথবা গল্পের অংশ বিশেষ মুখস্ত না করে যাতে ওটি সমগ্রভাবে মুখস্ত করে—সে কথা তাকে বুঝিয়ে বলা।

(৮) স্কুলের লেখা নোট—বাড়িতে এসেই ভালো খাতায় তুলে নেওয়ার অভ্যাস করানো।

(৯) পড়া শেষ করার আগে অধীত বিষয়টি মনে মনে কয়েকবার বলে নেওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্থ হয়ে ওঠা।

(১০) লেখাপড়ার ব্যাপারে শিশু যতদূর সম্ভব অন্যের সাহায্য না নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং ডিক্সনারী বা অভিধান, গ্রামার বা ব্যাকরণের সাহায্যে যাতে সে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিতে পারে, সে দিকে অভিভাবকদের সস্নেহ দৃষ্টি রাখা।

সাধারণতঃ অভিভাবকেরা মোটেই মান্‌তে চান না যে তাঁর ছেলে বা মেয়ে অন্য ছেলে বা মেয়েদের থেকে পিছিয়ে আছে। তাঁদের ধারণা সব শিশুই সমান। কাজেই পাঁচজনে যা পারবে তাঁদের সন্তানরাও তাই পারবে। তাই যখন তাঁরা ছেলে বা মেয়েকে পিছিয়ে পড়তে দেখেন তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকাকেই দোষারোপ করে থাকেন এবং অকারণে শিশুর ওপর হাত তুলে তার প্রতিশোধ নেন। কিন্তু তাঁদের একথাটা মনে রাখতেই হবে যে সকলেই একই রকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। তবে যে শিশু প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়—তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করা মা-বাবারই একান্ত কর্তব্য। প্রত্যেক মা-বাবাকেই লক্ষ্য রাখতে হয়—যাতে কি লেখাপড়া, কি অন্যান্য কাজ সমস্তই শিশুর বয়স ও মনের উপযোগী হয়। তাকে এমন কাজ দেওয়া উচিত নয়—যা পারব না মনে করে তাদের মনে একটা হীন ভাবের উদয় হয়। মনে রাখতে হবে কৃতকার্যতাই সমস্ত কাজের প্রেরণা জোগায় ও সাফল্য-নিয়ে আসে।

ছোট্টশিশুকে ইচ্ছেমতো আঁকতে দিয়ে, রং তুলি নিয়ে খেল্‌তে দিলে তার মধ্যে থেকেই লেখা ও আঁকার ঝোঁক আসে। আস্তে আস্তে খেলার ছলে পড়তে ও লিখতে শেখে। শিশুর মানসিক শক্তিকে একত্রিত করবার জন্য তার সংগ্রহের খেয়ালকেও প্রত্যেক মা-বাবাকে উৎসাহিত করতে হয়। বড়দের দৃষ্টিতে ছবিসংগ্রহ, নুড়ি সংগ্রহ, রাংতা সংগ্রহ, টিকিট সংগ্রহ যদিও তুচ্ছ খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এগুলি বিশেষভাবে শিশুর কৌতূহলকে কেন্দ্রীভূত করে এবং এর ফলেই তার মনে একাগ্রতা দানা বাঁধে। হাতে-কলমে সংগ্রহের আকাঙ্খা থেকেই বাইরের পৃথিবীটাকে সে চিন্‌তে শেখে এবং তার থেকেই জাগে তার মধ্যে জানার আগ্রহ। এই আগ্রহ থেকে সে লিখতে শেখে ও পড়তে শেখে।

শিশু মা-বাবার খুব আদরের জিনিস। বড় হয়ে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক—তার জীবন সবদিক দিয়ে বিকশিত হোক এটা সব মা-বাবাই কামনা করেন। তাই তখন তাঁদের উচিত নিজের শিশুটিকে বেশ ভালভাবে বিচার করে নিয়ে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এব্যাপারে তাঁরা ইচ্ছে করলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন। একাজে তাঁদের খেয়াল-খুশি মতো যত না এগিয়ে যান—ততই মঙ্গল।

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের গঠন

আজকাল অনেক লোকের মুখেই শোনা যায় যে, আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করছে না। সত্যি ভাবতে আশ্চর্য লাগে,—এমন একদিন ছিল, যেদিন আমাদের এই বাংলা দেশেই একসঙ্গে অনেক প্রতিভার জন্ম হয়েছে। আমাদের এই বাংলা দেশেই জন্ম নিয়েছেন—শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মণীষীরা। তবে আজ দেশের এ দুর্ভাগ্য কেন? কেন এত হতাশা চারিদিকে? আবার কি নতুন প্রতিভার জন্ম হবে না আমাদের এই দেশে?

আমরা ভুলে গেছি—আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শকে, ভুলে গেছি দেশের মহাপুরুষদের নির্দেশ-বাণী! তাইতো আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ভুলে আছি—'শিশু শিক্ষা'র মহান দায়িত্বকে। আবার আমাদের দেশে আদর্শ ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার সৃষ্টি হতে পারে যদি আমরা 'মানব-শিশু'দের দিকে চোখ ফেরাই। শিশুর চরিত্রে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার বিকাশ হয় শৈশবকাল থেকে মা-বাবার স-যত্ন শিক্ষার মধ্য দিয়েই। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে ছয়-সাত বছর বয়স থেকে শিশুর দিকে একটু একটু করে যত্ন নিলেই—তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অথবা প্রতিভার উন্মেষ হয়ে থাকে, কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে অন্য কথা। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলেছে: 'মাতৃগর্ভে অবস্থান কাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ছয় বৎসর পর্যন্ত শিশু যে শিক্ষা পায়,

তাই ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার পাথেয় হিসাবে সে গ্রহণ করে।' এই কারণেই সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সাত বছর পর্যন্ত মা-বাবা যদি সতর্ক হয়ে চলতে পারেন, তবেই শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে এবং মা-বাবা অনেক দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিজের দেশকে একটি 'দেবশিশু' উপহার দেওয়ার কল্পনা করতে পারেন।

জন্মের প্রথম বছরটিতে শিশু একেবারে নির্বোধ থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে তার জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবার দায়িত্ব অনেক যায় বেড়ে। এই সময় সে কথা বলতে ও হাঁট্‌তে শেখে। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে শিশু অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি সমস্তই এই অভ্যাসের মধ্যেই লুকানো থাকে। যে-ধরনের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে শিশু বড় হয়—তাই তার ভাবী জীবনকে প্রতিফলিত করে থাকে। এর জন্যেই মা-বাবার উচিত ছোটবেলা থেকেই শিশু যাতে সু-দৃষ্টান্ত এবং সু-অভ্যাসের মধ্য দিয়ে জীবন-পথে এগিয়ে যেতে পারে—তার ব্যবস্থা করা। অনেক মা-বাবার ধারণা যে, শিশু স্বাভাবিক উপায়েই মানুষ হতে পারে; কিন্তু এটাকে সত্য বলে মনোবিজ্ঞানীরা মোটেই স্বীকার করেন না। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ঃ 'শিশু প্রত্যেক দিনের আচার, ব্যবহার এবং অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলে। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে সকলের সুখ-দুঃখে সমভাগী হয়ে যদি সে গড়ে উঠতে পার—তবেই ভাবী জীবনে সে একটা গোটা মানুষ হিসাবে দেখা দেয়।'

শিশুর জন্মের কিছুক্ষণ পর থেকেই তার মধ্যে ক্রোধ, অনিচ্ছা এবং আনন্দ প্রভৃতির প্রকাশ দেখা যায়। এগুলোকে তার উত্তর জীবনে সু-শিক্ষার মধ্য দিয়েই তার চরিত্রের বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা যেতে পারে। সত্যের প্রতি বিশ্বাসী, দরিদ্রের প্রতি দয়ালু এবং জ্ঞানী, গুণী, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়ার শিক্ষা ছোটবেলাতেই সে মা-বাবার কাছে পায়। 'কোন্‌টা ভালো' আর 'কোন্‌টা মন্দ'—সে শিক্ষাও সে

মা-বাবার কাছেই গ্রহণ করে থাকে। মা-বাবার প্রথম কর্তব্যই হলো শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা এবং ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা। তাঁদের প্রত্যেক দিনের চলা-ফেরা এবং কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে তার কাছে গ্রহণীয় অংশগুলো তুলে ধরা। সামাজিক আচার-ব্যবহার শিক্ষাও মা-বাবার ব্যবহারিক জীবন থেকেই সে যাতে গ্রহণ করতে পারে, তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়ে এগিয়ে চলা। সাধারণতঃ সামাজিক আচার-ব্যবহার শিক্ষা, সমাজ পরিবার এবং পরিবেশ ভেদে তার মধ্যে প্রকাশ পায়। মা-বাবার গলার স্বর, শিশুর সঙ্গে ব্যবহার এবং মাতার প্রতি পিতার ব্যক্তিগত ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমেই তার চরিত্র বিকাশ লাভ করে থাকে ওগুলো আবার সে হু-বহু নকল করতে চেষ্টা করে।

শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব, তার চাইতে বেশী প্রত্যাশা করার ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। চরিত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ কখনও একদিনে সম্ভব হয় না। ব্যক্তিত্ব-বোধ ধীরে ধীরেই চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ লাভ করতে পারে। কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো করতে গেলেই অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসই শিশুকে ব্যক্তিত্বের পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন।

প্রত্যেক দিনের চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার এবং কাজের মধ্য দিয়েই শিশু তার চরিত্রের বিশেষ দোষ-গুণ গুলোকে নিজের আয়ত্বে আনে। খাওয়া, পোশাক পরা, পুতুল খেলা এবং বড়দের প্রতি ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে সামাজিক আদব-কায়দায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। এরপর একটু বড় হলেই স্বাভাবিক উপায়ে নিজেদের ভালোমন্দ সম্বন্ধে ভাবতে শেখে। ছোট বেলায় স্বাধীন চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের যে বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়—তাই ভাবী জীবনে তাকে মহান্ এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে।

মানুষের চরিত্রের একটা প্রধান গুণ হলো সত্যপরায়ণতা, এ কথা

নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন। ছেলেমেয়েরা সত্যবাদী হোক্ এটা সব মা-বাবাই চান। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের মিথ্যাচরণের জন্য যে মা-বাবাই অনেকাংশে দায়ী একথা অপ্রিয় হলেও নিশ্চয়ই তাঁরা স্বীকার করবেন। শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে, তখন মিথ্যা এবং সত্যের কোনও পার্থক্য স্থির করতে পারে না। পরে একটু একটু করে মনের মধ্যে পার্থক্য জাগতে থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, মা-বাবা শিশুর সঙ্গে নিজেদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। কোনও সময় হয়তো রাগের মাথায় ভয় দেখালেন, আবার কখনও হয়তো নিজের ব্যবহারের লজ্জাকর কোনও কিছুকে তার কাছে লুকোতে চেষ্টা করলেন। এ-থেকেই শিশু মিথ্যার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে এবং মা-বাবার উপর তার গভীর বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়ে।

কোনও ছোটখাট অপরাধ করে অথবা বাড়ির কোনও জিনিস ভেঙ্গে ফেলে ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বড়দের তিরস্কারের ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই সময়ে মা-বাবাকে অত্যন্ত ভুল করতে দেখা যায়। তাঁরা হয়তো তাদের অতিরিক্ত তিরস্কার করেন, যার ফলে ভয়ে তারা মিথ্যাচরণে অভ্যস্থ হয়। আবার অনেকে হয়তো খুব বেশী সহানুভূতি দেখিয়ে ছোটদের ভয় তাড়াবার জন্য আদর করে বলেন ঃ 'লক্ষী খোকন সোনা! কেন তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ? তুমি তো এটা করোনি! ঐ কালো মেনি বিড়ালটাই তো ওপথে যাবার সময় কাঁচের গ্লাসটাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে!' মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে মা-বাবা নিজে যদি কঠোর সত্যপরায়ণ হতে পারেন, তবেই ছোটদের সত্যভাষী করে তুল্‌তে পারবেন বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছোট-দের মনে নানা জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। বড়রা অনেক সময় এই সমস্ত প্রশ্ন-গুলোর উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন মনে করেন। তাই কখন বা ধমক দিয়ে তাদের থামান, আবার কখন বা ভুয়ো কথা দিয়ে তাদের মন ভোলান। জীবন-মৃত্যুর রহস্য অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্নের

উত্তর বড়দের এমন ভাবে দেওয়া উচিত যাতে তাদের কৌতূহল চাপা না পড়ে—বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরো উন্মুখ হয়ে উঠ্‌তে পারে। সকলের মনে রাখা উচিত যে, জগতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির মূলে রয়েছে মানব মনের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা! তবে এই প্রসঙ্গে মা-বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে এমন শিক্ষাই তাঁরা সন্তানকে দেবেন, যা ভাবী জীবনে তাকে সত্যবাদী করে তুলতে সাহায্য করবে, কিন্তু অপ্রিয়ভাষী করে তুলবে না।

মানুষের চরিত্রের প্রধান গুন হলো—দয়ামায়া, স্নেহ এবং ভালোবাসা। সংসারে নানা বীভৎস এবং কদর্যতার মধ্যেও মানুষের স্বতঃ উৎসারিত দেবতুল্য করুণা এবং মমতাই পৃথিবীকে সিক্ত এবং সঞ্জীবিত করে রেখেছে। তাই শিশুর চরিত্র গঠনে এই সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অবহেলা না করে, বরং দেখতে হবে—কেমন করে সেগুলি স্নেহ, মমতার রূপ-রস-গন্ধে দিনের পর দিন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে। তার সামনে নৃশংসতা বা রূঢ়তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করলে বিশেষ ফল দেখা দেয়। তার সামনে যাতে প্রাণী হত্যা না হয়—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়; এবং সাপ, বিছে ইত্যাদি মারলেও সাবধানে তার মারার কারণটা বুঝিয়ে দিতে হয়।

এই ব্যাপারে শিশুর কাছে গল্প বলার ছলে ও রূপকথা অথবা উপকথায় যেখানে হত্যা বা উৎপীড়নের কাহিনী আছে সেখানে এমন ভাবে তা বর্ণনা করতে হয়—যাতে তার সহানুভূতি উৎপীড়িতের দিকে আকৃষ্ট হয়। আবার রাজপুত্রের রাক্ষস বধের গল্পে শিশুর সহানুভূতি সাধারণতঃ রাজপুত্রের দিকে যেতে চাইবে। তার ফলে সে খানিকটা ভয় থেকেও মুক্ত হতে পারবে। ছোটদের কাছে গল্প বলার সময় বড়দের এই কথাটিই বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, যেন তাঁরা ছোটদের কাছে এমন গল্প তুলে ধরেন, যাতে ছোটরা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে খুঁজে পায় তার গল্পের নায়কের মধ্যে। গল্পের মধ্য দিয়ে শুধু আদর্শকে সামনে তুলে ধরলেই চলবে না—এর সঙ্গে তুলে ধরতে হবে ছোটদের

মনের আনন্দের খোরাক। তবেই সেই গল্প শিশুর মনকে স্পর্শ করবে।

শিশু খেলতে খেলতে ভাবে—'এই পুতুলটা তো আমিও তৈরী করতে পারি'—'এই ইঞ্জিনটাকে আমি ভেঙ্গে ফেলে আবার ঠিক করে দিতে পারি।' এই যে তার ভাবনা—এর মধ্য দিয়েই তার আত্মনির্ভরতা জন্মে এবং খেলার ছলে সে নিজের ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। প্রত্যেক দিনের চলার পথে যে সমস্ত সমস্যা শিশুর সামনে দেখা দেয়—আস্তে আস্তে তার সমাধান যাতে সে করতে পারে, সেদিকেও মা-বাবাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এর ফলেই শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে অতুল ব্যক্তিত্বের আধকারী হয়ে বড় করে তোলে নিজের সমাজ এবং দেশকে।

শিশুর ব্যক্তিত্বকে জাগাতে হলে, তার মনকে আগে জানতে হবে, আর জেনে নিতে হবে তার মনের মাণর খনির সন্ধান। শিশুকে বুঝে নিয়ে, তার মনের মতো আদর্শকে সামনে রেখে, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই—তার চরিত্রে মহান্ ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখা দিতে পারে। আর দেখা দিতে পারে জাতির দেহে প্রাণের জোয়ার!

শিশুর বিচিত্র আবেগানুভূতি

শিশু-শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো তার মনের বিচিত্র আবেগানুভূতিগুলি বুঝে নিয়ে তাদের ঠিক পথে পরিচালনা করা। বড়দের মতো ছোটদের মনেও যে কল্পনা, ভয়, ক্রোধ, অবিশ্বাস ও কৌতূহলের সমাবেশ হয়ে থাকে—তা বড়রা অনেকেই অনেক সময়েই বুঝেও বোঝেন না। মনের এই আবেগ সাধারণ জীবনকে রঙীন এবং রসাল করে তোলে। কিন্তু ঠিক সময়ে রাস টানতে না পারলে এরাই আবার প্রচুর ক্ষতি সাধন করে থাকে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের খেয়ালের অভাবে অনেক সময় এই আবেগের ঘূর্ণি—শিশুর মনোব্যাধি হিসাবে দেখা দেয়। এর ফলে মানব-শিশুকে বেশীর ভাগ সময়েই সমাজ-জীবন থেকে বিদায় নিয়ে পাগলা গারদের গণ্ডির মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। মানব-জীবনে আবেগ বা প্রক্ষোভের প্রভাব যখন এত বেশী, তখন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উচিত শিশু-মনের বিচিত্র আবেগানুভূতিগুলো জেনে নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

শিশু-মনের কল্পনা ঃ সমস্ত শিশুই তাদের খেলাধুলা ও দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চলতে ভালোবাসে। তাই কখনও পুলিসের বেশে, আবার কখনও শিকারীর বেশে কাঁধে লাঠি নিয়ে খেলার ভান করে থাকে। আবার সামনে কোনও চেয়ার অথবা বাড়ির বারান্দার থামকে সাথী কল্পনা করে নানা কথা বলে এবং বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করে। বেশ একটি রসাল ছবি মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে ছোটরা মনের আনন্দে মশগুল হয়ে থাক্‌তে ভালোবাসে। এই কল্পনার মধ্যে

অনেক সময় ভয়ের আবির্ভাবে তাদের কল্পনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং ওরা ভীত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে বড়দের উচিত ওদের এই ভয় দূর করে স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মনস্তত্ত্ববিদ্ স্টার্নের স্ত্রী কারা নিজের সন্তানের বিভিন্ন বয়সের বিচিত্র আবেগানুভূতির অভিব্যক্তি পর্যাবেক্ষণ করে তা রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে রেখে, মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষার কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তা থেকে আমরা শিশুর বিভিন্ন বয়সের কল্পনার খবর পেতে পারি। তিনি তাঁর রোজনামচার পাতায় লিখেছেন ঃ

> 'আমার কন্যা হিণ্ডের বয়স তখন মাত্র দু'বছর আড়াই মাস। সে একটা চৌকো কাঠের টুক্‌রো নিয়ে বল খেলছিল। হঠাৎ সেটা মাথায় রেখে—আমার দিকে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো—দেখেছো—মা—আমার কি সুন্দর টুপি !···আবার হিণ্ডের বয়স যখন দু'বছর পাঁচ মাস, তখন ওর পিসিমার পাশে বসে তার জামা নিয়ে খেলতে খেলতে, প্রথমে ওটা পাকিয়ে নিয়ে একটা বল করে ছুড়ে মারতে গেল। পরক্ষণেই সেটা আঙ্গুলে জড়িয়ে একটা ব্যাণ্ডেজের মত করে নিলে। এরপর আবার সেটা খুলে নিয়ে আমাকে ডেকে বললে—'এই দেখ মা —এটা হলো একটা প্লেট।'

মনোবিজ্ঞানীদের উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ছোটরা সত্যিকারের জিনিস নিয়ে খেলার চাইতে কল্পনার তৈরী জিনিস নিয়ে খেলতেই আনন্দ পায় বেশী। তাই তারা একটা ন্যাকড়া দিয়ে পুতুল তৈরী করে অথবা বালি নিয়ে নানান্ মূর্তি তৈরী করে খেলতে ভালোবাসে। সত্যিকারের পুতুল হাতে দিলে অনেক সময় তা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলে এবং পরে তা দিয়েই খেলতে চেষ্টা করে।

ভয় ঃ শিশুর মনের কল্পনার মতো—ভয় পাওয়াও তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। জন্ম নেওয়ার পর থেকেই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ওদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। আকস্মিক

বিপুল পরিবর্তনও তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করে থাকে। খুব জোরে কোনও শব্দ হলে অথবা খুব জোরে কিছু নড়ে উঠ্‌লে শিশু ভয় পায়। এই জন্যই সে কুকুরকে ভয় করে। তার মন থেকে এই কুকুর-ভীতি দূর করতে হলে নানান্ রকম মজার কুকুরের গল্প বলে—তা দূর করতে হয়। ছোটরা যদি দেখে যে বাবা অথবা মা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন, তবে তারাও নির্ভয়ে কুকুরের কাছে এগিয়ে যাবে এবং মা-বাবার মতো কুকুরের গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করবে। এই ভাবেও কুকুর-ভীতি দূর হতে পারে।

ধরা যাক একটি শিশু বাড়ির মিনি বেড়ালকে খুব ভয় করে। তার কারণ—একদিন যখন সে আদর করে মিনিকে ধরতে যাচ্ছিল—তখন বাড়িতে একটি কিছু পড়ে গিয়ে ভীষণ শব্দ হয়েছিল—সেটাই নিরীহ মিনির প্রতি তার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি মিনির ধরনের একটা কাপড়ের বেড়ালও তার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এই কারণেই। তা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে যদি মা-বাবা আস্তে আস্তে ভয়ের বস্তুটিকে তার কাছে নিয়ে এসে আদর এবং খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে ভয়টিকে দূর করার চেষ্টা করেন।

শিশু অন্ধকারকে খুব ভয় করে। তার কারণ হলো 'মা' হয়তো কোনও দিন শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়েছিলেন; সে ভয়টা বড় হয়ে তার মনে রয়ে গেছে। তাই অন্ধকার ঘরে সে একলা কিছুতেই থাকতে চায় না। তার এই ভয় দূর করা সম্ভব শুধু নানান্ ধরনের গল্প বলে। অথবা তার মাথার কাছের আলো অল্প অল্প করে কমিয়ে নিয়ে—যখন একদিন তা একেবারে নিবিয়ে দেওয়া হবে, তখন সে আর টেরই পাবে না এবং অন্ধকারে থাক্‌তে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠ্‌বে।

শিশু নিজের আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবেই পশুপাখী, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, কোলাহল, টিকটিকি, আরশোলা প্রভৃতির ভয়ে 'মা' অথবা বড়দের আশ্রয় নিয়ে থাকে। বড়রা তখন তার এই ভয়কে যদি

এড়িয়ে যেতে চান তবে তার বিরক্তিভাজন হয়ে থাকেন। তার কারণ শিশুর পক্ষে এই ভয় খুব স্বাভাবিক। এই কারণেই বড়দের উচিত ছোটদের কাছে পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুর স্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া। যে প্রাণী থেকে সে ভয় পেতে পারে সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে এই সমস্ত অকারণ ভয় থেকে তাকে মুক্ত করা যেতে পারে। এই ধরনের ভয়-প্রবণতা তাকে শুধু পঙ্গু করেই রাখে না তার শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায় হয়েও দাঁড়ায়।

শিশুদের মনে 'ভূতের ভয়' বিশেষ ভাবে দেখা যায়। বড় হয়েও এই ভয় তার মন থেকে মোটেই দূর হয় না এবং এই ভয়ই তাকে কাপুরুষ এবং ভীতু করে তোলে। এই ভূতের ভয়ের জন্য দায়ী অভিভাবক-অভিভাবিকারা এবং শিশু-সাহিত্যের বাজে সব ভূতুড়ে গল্প। অনেক সময় শিশু যখন কারো কথা শোনে না তখন বড়রা ভয় দেখান—ভূতের অথবা ব্রহ্মদৈত্যের। অবিশ্যি এতে চমৎকার ফল পাওয়া যায়—তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বড়দের আদেশ পালন করে। কিন্তু এই ভূতের অথবা দৈত্যির ভয় তাকে পেয়ে বসে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্যক্তি হয়েও এই ভয়ের হাত থেকে রেহাই পান না। শিশুরা যদিও ভূতের গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে, কিন্তু এই সমস্ত কারণে কিছুতেই ওদের কাছে ভূতের গল্প বলা উচিত নয়। তবে একান্তই যদি ভূতের গল্প শোনার ওরা বায়না ধরে তবে সত্যিকারের যে ভূত বলে কোনও পদার্থ নেই—সেই ভাবেই গল্পের রূপ দেওয়া যেতে পারে। অনেক শিশুর মধ্যে কতকগুলো পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ আতঙ্ক দেখা যায়। এই ধরনের মনোভাবকে 'ফোবিয়া' (Phobia) বা অহেতুক ভয় বলা হয়। যেমন অন্ধকার ঘরে গেলেই সে ভয় পায়, একলা ত্বপুর বেলায়ও কোন নির্জন স্থানে থাক্‌তে দিলেই আতঙ্কে কেঁদে ওঠে। আবার আরসোলা, টিক্‌টিকি, বেড়াল, ই হুর, কুকুর প্রভৃতি দেখলেই ভীত হয়ে ওঠে। এই ফোবিয়াগুলো শিশুকালে দূর করতে না পারলে—তার উত্তরজীবনে বিশেষ ত্বঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময়ে মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শিশু ভয় পায়। কোনওদিন সে হয়তো রাস্তা দিয়ে চলেছে—তখন পেছন থেকে এসে একটা গাড়ি বিকট ভাবে হর্ন বাজালো। এতে সে আচমকা ভীষণ ঘাবড়ে গেল এবং পরে এই ঘটনাটি একেবারে ভুলে গেল। কিন্তু এরপরে দেখা যেতে লাগলো যে সে সব কিছুতেই ভয় পায়। মৃত্যু তার কাছে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার। তাই সে মৃত্যু দেখে খুব ভাবতে থাকে এবং সব সময় ভাবে সে মরে যাবে। এই ভয় প্রায় সময়েই মানসিক বিকারে দাঁড়ায়। এই কারণেই সহজ ভাষায় বড়দের শিশুদের কাছে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় যে মৃত্যু একটি স্বাভাবিক ঘটনা—তার জন্য তার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

অনেক সময় দেখা যায় মা-বাবা চান শিশু সকলের কাছে নিজেদের অভিপ্রেত একটি আদর্শ স্থাপনা করুক। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে তার সেই আদর্শ সফল করে তোলার ক্ষমতা মোটেই নেই। তাই মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সে সকল সময় ব্যর্থ হতে লাগল এবং এ থেকেই তার মনে একপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হতে শুরু করল। আবার অনেক সময়ে কোনও নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যেয়ে তার মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং এর থেকে তার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই ভয়ই আবার মনে বিশেষ ভাবে শিকড় গাড়ে যখন—ব্যর্থতার জন্য বড়দের কাছে সে শাস্তি পায়।

অবিশ্বাস ঃ অনেক সময় ছোটরা অন্যায় না করেও 'মা' অথবা 'বাবার' কাছে বকুনী খায়। একটা বেড়ালে হয়তো আচারের বয়ামটা ভেঙ্গে দিয়ে গেলো। শিশুর কাছে সত্যি ঘটনা শুনেও হয়তো বড়রা সে কথাটা বিশ্বাস করেন না—ফলে, শিশুর মনে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস জমে ওঠে। নানান্ কারণে ছোট বেলার এই অবিশ্বাস তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খুব খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকে যদি সত্যবাদী এবং বিশ্বাস-যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়—তবে বড়দের আগে তার কাছে বিশ্বাসী হয়ে দেখা দিতে হবে।

শিশু যখন শত অন্যায় করেও তা অম্লান বদনে মা-বাবার কাছে স্বীকার করে—তখন তাকে শাস্তি না দিয়ে যদি মা-বাবা তা সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নেন—তবে সে বড়দের আচরণে খুশি হয় এবং ভবিষ্যতে কখনও মিথ্যা আচরণ করতে চেষ্টা করে না। সে বোঝে যে, ওর অন্যায়ের জন্য যদিও 'মা' শাস্তি দেন, কিন্তু তার সত্যিকথা বলার জন্য 'মা' নিশ্চয়ই আদর করবেন।

অনেক সময় আবার মা-বাবা শিশুর সঙ্গে নিজের ব্যবহারের সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। হয়তো রাগের মাথায় তাকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেন, কাজের বেলায় তার কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। ক্ষণিক উত্তেজনায় এ রকম মিথ্যা ভয় দেখানোর ফলে তার মনে মা-বাবার প্রতি অবিশ্বাস জমে ওঠে। একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'ছেলেকে খুন করবে বলেছো তো খুনই করে ফেল্‌বে।' তবে বলার আগে সমস্ত বিষয়েই বিচার-বিবেচনা করে নিয়ে, তবে তা বলতে অথবা করতে হবে।

অনেক সময়েই নিজেদের মেজাজ ঠিক থাকে না বলে শিশুর ওপরে মা-বাবা অন্যায় আচরণ করে ফেলেন। কিন্তু ছোটরা সব সময়েই বড়দের ন্যায়ের আসনে, দেখতে চায়। অন্যায় করলে বড়রা যদি আদর করে তাদের সে কথা বুঝিয়ে দেন, তবে তারা অন্যায় করে—বড়দের কাছে তা লুকোতে চেষ্টা করবে না। মা-বাবার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেলেই শিশু গুরুজনদের ভক্তি করতে শেখে ও অন্যের উপর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বেশীর ভাগ সময়েই অনেক ব্যাপার আমরা ছোটদের কাছ থেকে লুকোতে চেষ্টা করি। যেমন—মা-বাবা সিনেমা দেখে এসেছেন, তা লুকোতে চেষ্টা করলেন—বাড়ির ছোট্ট ছেলেটির কাছে। কিন্তু সে তা ধরে ফেল্‌লে। বল্‌লে ঃ 'আমি জানি তোমরা সিনেমায় গেছলে।' তখন ধাঁ করে হয়তো মা পিঠে একটি কিলই বসিয়ে দিলেন—সে বিনা দোষে শাস্তি পেল। এর ফলে বড়দের ওপর ওর অবিশ্বাসই জেগে রইল চিরদিনের জন্য।

শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে মা-বাবার কঠোর সত্যপরায়ণ হওয়া যে শিশুকে সত্যভাষী এবং বিশ্বাসী করে তোলবার পক্ষে একটা প্রধান নীতি—এটা শিশু-মনোবিজ্ঞানের অতি আধুনিকতম আবিষ্কার বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ঈর্ষা ঃ পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু খুব অসহায় থাকে। তখন পর্যন্ত উঠতে-বস্‌তে-খেতে মা'র সাহায্য তার অপরিহার্য হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় তখন পর্যন্ত খুব সামান্যই থাকে। 'মা'ই তখন তাকে নিয়ে থাকেন। এর পরে হঠাৎ যখন আর একটি শিশুর আবির্ভাব হয় মা'র কোলে—তখন বড়টির মনে ধীরে ধীরে ঈর্ষা জন্ম নেয়। একদিন মায়ের কোলের কাছে যে জায়গাটি আলো করে সে ঘুমোতো—এখন ঐ জায়গাটি দখল করে আছে এক নবাগত। এ দেখে তার মনে খুবই দুঃখ হয়। সে মনে মনে ভাবে—মা আর তাকে আগের মতো ভালোবাসেন না। তখন স্বভাবতই ছোটটির উপর মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন শিশুর বিছানা মা'র বিছানা থেকে আলাদা না করে নিয়ে যদি তাকে আস্তে আস্তে জানান হয় যে সে বড় হয়ে গেছে। আর মা'র কোলটি ঘেঁষে তার ঘুমোনো উচিত নয়। তা ছাড়া তার একটি নতুন ভাই বা বোন আসছে। সে তো তার চাইতে ছোট—তাই সে থাক্‌বে এখন মা'র সঙ্গে। এই ভাবে আগে থাকতে সমস্ত কিছু জানিয়ে দিলেই নবাগতের উপর আর তার ঈর্ষার ভাব দেখা দেবে না। 'মা' ছোট্ট ভাইটি বা বোনটিকে স্নান করান, খাওয়ান এবং আদর করেন। এটা কিন্তু বড়টি মোটেই পছন্দ করে না। এই কারণে এগুলো যতদূর সম্ভব তার আড়ালে করাই শ্রেয়। তাকে বোঝাতে হবে—ছোট ভাই বা বোনটির জন্য 'মা' যা করছেন—তা, ও খুব ছোট বলেই করছেন। মাঝে মাঝে ছোট ভাই বা বোনের কাজে তাকে সাহায্য করতে বল্‌লে—সে তা খুশি মনেই করে এবং তার মন থেকে ঈর্ষার ভাব দূর হয়। আবার ছোট্ট শিশুটি একটু বড় হয়ে ওঠে—দাদার জামা-কাপড় ও খেলনা

প্রভৃতিতে হাত দিতে শুরু করলেই—দাদা বিরক্ত হয়ে পড়ে। এই বিরক্ত থেকে ও হয়তো দু'এক-ঘা ছোট ভাইটিকে লাগিয়েও দিতে পারে। এমন সময় মা অথবা বাবা এসে যদি বড়কে কেবল তিরস্কারই করেন, তবে সমস্ত রাগ ছোটটির ওপর গিয়ে পড়ে। এ থেকেও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দেখা দেয়।

ক্রোধঃ শিশুদের মধ্যে নানান্ কারণে ক্রোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত ক্রোধের মাত্রাটা একটু বেশী থাকে। তখন শিশু নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে শুরু করে এবং তার স্বাতন্ত্র্য জাহির করতে চেষ্টা করে। বড়দের সমস্ত কিছু মাথা পেতে মেনে নিতে চায় না। সে নিজেকেও তখন কর্তাব্যক্তি বলে মনে করে। এ ছাড়া কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করলে, অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। ছোট ভাইটিকে সে মনে মনে হিংসা করে। তার কারণ হলো 'মা' তাকে একটু বেশী ভালোবাসেন। ফলে, মাঝে মাঝে ছোট ভাইটিকে চড়-চাপড় লাগায় এবং সবার ওপরেই কেমন যেন একটা রাগ রাগ ভাব দেখায়। এই অহেতুক রাগ তার অবচেতন মনের লুকোনো ঈর্ষার ফল ছাড়া আর কিছুই নেয়।

সুপরিচালনার অভাবে ক্রোধবৃত্তি যদি অসংযত থেকে যায় তবে তা মানসিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেই। এর ফলে বড় হয়েও ওর মাথাটা গরম থেকে যায় এবং কারণ-অকারণে সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। আবার অত্যধিক আদর অথবা শাসনের ফলেও শিশুরা বদমেজাজী হয়ে পড়ে। সবাই মিলে তাকে মাথায় তুলে রাখলেও—সে অহঙ্কারী হয়ে পড়ে। যখন যা চায়—তা না দিলেই কেঁদেকেটে পাড়া মাথায় তুল্তে চেষ্টা করে।

শিশুর ক্রোধ বেড়ে গেলেই প্রথমে অনুসন্ধান করে দেখতে হয়—(ক) তাদের মনের মধ্যে কোনও সমস্যা আছে কিনা? (খ) তাদের মনের গভীর প্রদেশে কোনও সংঘাত উঁকি দিচ্ছে কিনা? শিশুদের ক্রোধকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ (১) সক্রিয়, (২) নিষ্ক্রিয়। চটে

গেলে কেউ কেউ হাত-পা ছুড়ে, অজস্র অকথ্য-ভাষা ব্যবহার করতে থাকে। পশুর মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। ঐ সময়ে ওকে বাধা দিতে গেলে অথবা থামাতে গেলে আরও উগ্র হয়ে ওঠে। এই পর্যায় বা অবস্থাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন—'মেজাজ-বিপর্যয়' অর্থাৎ 'Temper Tantrum'। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনও শিশু হঠাৎ খুব শান্ত অথবা উদাসীন হয়ে পড়ে। মুখে বিষাদের ছায়া এবং সমস্ত কিছুতেই বিরক্তির ভাব। একে নিষ্ক্রিয় ক্রোধের ভাব প্রকাশ বলা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানী কেনার (Kanner) বলেছেন ঃ 'রাগটা মেয়েদের চাইতে ছেলেদের বেশী। আবার যে যত নির্বোধ—তার মধ্যে রাগ তত বেশী।'

কোন সময়ই মা-বাবার ছোটদের ক্রোধ কমানোর ব্যাপারে অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। স্নেহ বা সহানুভূতি হারালে ছোটরা সব সময়ই নিঃসহায় হয়ে পড়ে। খুব ছেলেবেলায় রাগ কমানোর ব্যাপারে, (ক) উৎকোচ প্রদান, (খ) রাগের বিষয় থেকে তার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করা, (গ) রাগের কথায় কান না দেওয়া এবং বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে, (ক) কেবলমাত্র উদাসীনতা এবং (খ) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অনেক সময় কার্যকরী হয়ে থাকে।

অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মনে রাখতে হবে, শৈশবে ক্রোধ সংযত না করতে শেখালে শিশু বড় হয়ে অসুখী হবে এবং কারো সঙ্গে তার বনিবনা হবে না এবং কলহের মধ্য দিয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে।

কৌতূহল ঃ শিশুর জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে কৌতূহলই হলো প্রধানতম। কৌতূহল অনুকরণ প্রিয়তা থেকেও তীব্র হয়। কৌতূহলকে নতুন জানার ক্ষুধা বা appetite for new experience বলা যেতে পারে। শৈশবে প্রত্যেকটি জিনিসই শিশুর কাছে নতুন। তাই সমস্ত জিনিসই তার মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে থাকে। রঙ্গীন কোনও পুতুল বা খেলনা সামনে রাখলে সে কান্না ভুলে তা হাত-পা নেড়ে দেখে খেলতে শুরু করে। খেলনাটিকে যদি সরিয়ে

নেওয়া যায়—তবে সে সেইদিকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কৌতূহলের মধ্যে দিয়েই শিশুর যদি পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে জ্ঞান আসে—তবেই সে নিজেকে সব কিছুতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আগুনে হাত পোড়ে, পোকাতে কামড়ায়, ছুরিতে কাটে, জল গরম বা ঠাণ্ডা—এই সমস্ত ব্যাপারে যদি শিশু কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবে জীবনে সেটা তার সবচাইতে বেশী কাজে আসে।

মা-বাবাই ছোটদের ঔৎসুক্যকে ঠিক পথে পরিচালনা করে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে মহীয়ান করে গড়ে তুলতে পারেন। শিশুর মনের অনন্ত কৌতূহলের মধ্যে সমস্ত সময়ই 'কী' 'কেন' 'কোথায়' প্রভৃতি প্রশ্নগুলো ভরে থাকে। এগুলোর যথাযথ উত্তর না পেলে তার মন তৃপ্ত হয় না। 'মা' অথবা 'বাবার' মন-মেজাজ ভালো থাকলেই শিশু তার প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর পায়, কিন্তু তাঁরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তার কৌতূহলগুলো গালমন্দ দিয়ে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মনীষী Plato বলেছেন ঃ 'কৌতূহল সমস্ত জ্ঞানের জনক।' কিন্তু দুঃখের বিষয় অভিভাবক-অভিভাবিকারা কৌতূহলকে আমোদ-প্রমোদের পর্যায় ভুক্ত করে ফেলেন বলেই, তাঁদের কাছে ছোটদের প্রশ্নগুলো পাকামির নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন—'এটা কী?' 'ওটা কী?' 'এটা দিয়ে কী হয়?' 'এটা কোথা থেকে এলো?' ইত্যাদি থেকে 'কেন' প্রশ্নটাই ওর জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। অন্যান্য ব্যাপারের মতো যৌন ব্যাপারেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কৌতূহল জেগে ওঠে। শিশু যখন থেকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করবে—তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে তার শিক্ষা শুরু হওয়া দরকার। বাড়িতে একটি নতুন শিশু জন্মালে বড়টি যদি ওর জন্ম-রহস্য জানতে চায়—। তাহলে এই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর কী ভাবে দিতে হবে তা ভেবে দেখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

তাই মা-বাবাকে আস্তে আস্তে শিশুর জন্ম-রহস্য বোঝাতে গিয়ে বলতে হয়, মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে কী করে কচি চারাগাছ জন্মায়, কী

কৌশলে ডিম থেকে পাখীর বাচ্চা হয়, কেমন করে ভ্রমর মধু সংগ্রহের উপলক্ষে এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে বহন করে নতুন ফুলের সূচনা করে। তার নিজের জন্মের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে সে মায়ের পেটের মধ্যে ছিল—পেট কেটে ওকে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে।

মোটের উপর যৌন শিক্ষা যখনই আরম্ভ হোক, মা-বাবার সহযোগিতায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এ শিক্ষা পরিপূর্ণ হওয়া চাই যৌবনের সীমায় পা দেওয়ার আগেই। তা না হলে কুসংসর্গে পড়ে, শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য শিশু ভুল পথ ধরে চলে। এই কারণেই মা-বাবার উচিত স্পষ্ট কথার মধ্য দিয়ে তাকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলা। অনেক সময় শিশুর মনে নিজের অথবা সঙ্গী সাথীর জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শরীরের অন্যান্য অংশের মতো এই ব্যাপারে তার কৌতূহল জাগাই তো স্বাভাবিক! অনেক সময় ইজের পরা না থাকলে মা-বাবা ছোটদের খুব গালমন্দ করে থাকেন। এর ফলে তার লক্ষ্য বিশেষ দিকে ধাবিত হয় এবং কৌতূহল বেড়ে ওঠে। তখন তাদের ঐ কৌতূহল থেকে নিবৃত্ত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে তাকে ঐ রকম তাড়া না করে যদি 'বেড়ু' করতে যাওয়ার নাম করে ইজের পরানোর অভ্যাস করা যায়, তবে এই নগ্নতা ঢাকার ব্যাপারে তার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হয় না এবং ক্রমে ক্রমে সে ইজের পরতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

রূপকথা ও শিশুমন : সব শিশুদের কাছেই রূপকথার গল্প অমৃত সমান। গল্পের খোঁজ পেলে ওরা আর কিছুই চায় না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছোটরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। ঠাকুমা ও দিদিমারাই আমাদের দেশে ছোটদের রূপকথার গল্প শুনিয়ে এসেছেন। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্রের রাজকন্যের সন্ধানে ছুটে চলা। সাত সমুদ্দর আর তের নদী পার হয়ে রাক্ষসপুরী থেকে রাক্ষসদের মেরে রাজকন্যেকে নিয়ে এসে রাজরানী করা। আর ঘুঁটে কুড়োনিকে দুয়ো রানীর চরিত্রে পেয়ে খোকাখুকিদের যে আনন্দ—তা চিরকালের। 'সাত ভাই চম্পা জাগো

রে……কেন বোন পারুল ডাকো রে'—গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়া—এ চলেছে আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে। এখন কথা হলো—এই ধরনের গল্প ছোটদের মনকে স্পর্শ করে কত খানি? অনেকের প্রশ্ন ডাইনীবুড়ি, রাক্কস-খোক্কস, দৈত্যি-দানব এই সমস্ত গল্প কাহিনী বলা ছোটদের কাছে ঠিক কিনা? সমস্ত দেশের ও সমস্ত জাতের ছোটদের রূপকথার মধ্যে এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। এই ধরনের গল্প কী ক্ষতি করছে ছোটদের? বলাই বাহুল্য বলার ভঙ্গীতে এই সমস্ত গল্প কাহিনী ছোটদের মনে অসীম সাহসের সঞ্চার করে ও ন্যায়-অন্যায়ের বিভেদ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ওরা নিজেদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে খুব সহজেই। তবে ভূতুড়ে বা অকারণ ভয়ের গল্প কাহিনীগুলি সদা সর্বদাই তাদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হয়।

শিশু শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

খুব বেশী দিনের কথা নয়—আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের কল-কারখানা আর খনিতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শ্রমিকরূপে নিয়োগ করা হতো। ঐ সমস্ত কল-কারখানা আর খাদে ছোট ছোট হুধের বাচ্চাদের দিনে চৌদ্দ থেকে পনের ঘণ্টা পর্যন্ত খাটতে হতো। শারীরিক অসুস্থতার জন্য যারা একসঙ্গে বেশীক্ষণ কাজ করতে সক্ষম হতো না, তাদের উপর চলতো মালিকদের অকথ্য অত্যাচার। প্রচুর পরিশ্রম এবং শারীরিক খাটুনীর ফলে অকালে স্বাস্থ্য নষ্ট করে পঙ্গু হয়ে 'অনাথ আশ্রমে' পরের গলগ্রহ হয়ে কাল কাটাতে হতো এই সমস্ত শিশুদের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমেরিকা এবং আফ্রিকাতে ছোটরা বিক্রীত হতো ধনী-বণিকদের কাছে দাসরূপে। ধনী গৃহে তাদের দেওয়া হু'টি অন্নে কোন রকমে পেট ভরাতো তারা কল-কারখানা আর খনিতে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে। তারাও যে মানুষ—আলোর ইশারা যে তাদের সামনেও নতুনের সন্ধান নিয়ে দেখা দিতে পারে—সে কথাটি ভাবতেও পারত না কেউ। আর কেউ বুঝতেও চেষ্টা করত না—আজ যারা শিশু ও কিশোর তারাই যে আগামী দিনে দেখা দেবে দেশের জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী আর রাষ্ট্রনায়ক রূপে। তাই ছোটরা যত্রতত্র অবহেলিত এবং নিপীড়িত হয়ে অকালে ঝরে পড়ত।...

এদিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ল ইংলণ্ডের লোকদেরই। ইংরেজ কবি রবার্ট সাউথে (Robert Southey) তাঁর কবিতার ছন্দে জানালেন ঃ

'ছোটদের কলকারখানায় নিয়োগ, দাস প্রথার চাইতেও ভয়াবহ এবং ভয়ানক'। নানান দিকে ছোটদের রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হলো ইংলণ্ডে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের ইচ্ছায় পার্লামেন্টে ছোটদের রক্ষার জন্য আইন তৈরী হলো। সেই থেকে ইংলণ্ডে আঠার বছরের আগে কাউকে শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করা নিয়মবিরুদ্ধ। ইংলণ্ডের এই বিপ্লবের ঢেউ লাগলো এসে অন্যান্য দেশেও। বিখ্যাত রুশ বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়াতে শিশুদের অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা হলো। শিশু মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষা এগিয়ে চললো। আমেরিকা এবং আফ্রিকাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলো না। সেখানেও ছোটদের কলকারখানা ও খনিতে নিয়োগ রদ হলো এবং তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হতে লাগলো। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকায় 'জাতীয় রক্ষা' আইনের বলে ছোটদের অমানুষিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে শিশু রক্ষা এবং শিক্ষার আয়োজন শুরু হলো।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কিন্তু পুরোন দিন থেকেই ছোটদের জাতীয় সম্পদ বলে স্বীকার করে এসেছে। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছে বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়ে এবং শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাই ছোটদের কাটাতে হয়েছে গুরু গৃহে। আমাদের এই দেশেরই মহা পণ্ডিত চাণক্য শিশু শিক্ষার জন্য বিধান দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রম্ মিত্রবদাচরেৎ'।

আজ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি আর শিক্ষার ধারাকে। তাই পাশ্চাত্যের কাছে মাথা খুঁড়ে মরছি পদে পদে। একালেও আমাদের কবি গেয়েছেন ঃ

"ইহাদের কর আশীর্বাদ!
ধরায় উঠেছে ফুটি, ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।"

বিদেশে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এগিয়ে গেছেন অনেক দূর ! মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে চলেছে 'নিজেকে জানার চরম সাধনা'। এই সাধনার পথে ওরা জেনেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন—কোনও কিছুকে বিশেষভাবে জানতে হলে গোড়া থেকেই হওয়া চাই তার শুরু। তাই মনোবিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হিসেবে চলেছে শিশু মনোবিজ্ঞানের গবেষণা। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম ছোটদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন। শুরু হলো বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান। 'শিশু কিভাবে বড় হয় ? পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুর মন গঠনে কতটুকু সাহায্য করে ? শিশুর জীবনে বংশগতির ধারা অপরিহার্য কিনা ?' —এ প্রশ্নের উত্তর মিললো আর শিশু মনোবিজ্ঞান এগিয়ে চলল অগ্রগতির পথে।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জি স্ট্যানলে হল (G. Stanley Hall) প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ছোটদের মনের বিকাশের ধারাটিকে আবিষ্কার করলেন ! এরপর এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বয়স এবং শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে পরীক্ষার কাজ এগিয়ে চললো। মনো-বিজ্ঞানী গিলবার্ট (Gilbert) এবং বিনেট (Binet) স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'বুদ্ধির পরীক্ষা' (Intelligence Test)-র ব্যবস্থা করলেন। কতকগুলি 'বুদ্ধির প্রশ্ন' সাজিয়ে নিয়ে ছোটদের কাছে ধরা হলো এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো পর্যালোচনা করে একটি ক্রমিক মান (Standard) তৈরী করা হলো। কোন্ বয়সে শিশুর কতটুকু বুদ্ধি থাকা দরকার—কতটুকু না হলে তাকে স্বাভাবিক শিশু না বলে 'পেছিয়ে পড়া' অথবা 'জড়-বুদ্ধি'-শিশু আখ্যা দেওয়া হবে সবই এই পরীক্ষা থেকে ঠিক করে নেওয়া হলো। সেই অনুযায়ী ওদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হলো। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন করে দেওয়া হলো। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল অভিভাবকদের উদ্দেশ করে বললেন : 'Reasonable parents create reasonable child'—'বিবেকবান পিতামাতার সন্তানই বিবেকবান হয়ে থাকে।'

সমস্ত ভালো কাজে যাঁরা শুরুতে, অগ্রণী দল হিসাবে পথ করে নিয়ে যান, তাঁদের পরিশ্রম, ত্যাগ এবং সাধনার ফলেই ভাবী কালের ভিত তৈরী হয়। দধীচির আত্মত্যাগেই বজ্রের সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই বজ্রেই হয়েছিল অসুরের বিনাশ।···মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে শিশুর মন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাদের মনের উপর চলতে লাগলো নানারকম পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষা। ক্রমে ক্রমে শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হতে লাগল। নার্সারী স্কুল এবং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি শিশুশিক্ষায় বিপ্লবের সূচনা করল। ম্যাডাম মণ্টেসরি তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি থেকে শাস্তি হিসেবে শারীরিক নির্যাতন একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন।

শিশুর মনের রহস্য উন্মোচনের এই যে প্রয়াস—আজও তার শেষ হয়নি। কারণ বিজ্ঞানের গতি কখনও স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে না। তাই শিশু মনোবিজ্ঞানের গতিও এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। ছোটদের নিয়ে যাঁদের কারবার, ছোটদের যাঁরা সংগঠক, আমাদের দেশে যাঁরা ছোটদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, তেমন শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং সংগঠকদের শিশু মনোবিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞান থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর প্রয়োজন আছে, আমাদের দেশে ছোটদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণার। বিদেশে, মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ যে ক'টি ধারা পর্যালোচনা করে অনুসরণ করলে আমাদের দেশের অভিভাবক ও সংগঠকদের কাজে আসতে পারে--এখন সেই সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

শিশুর বংশগতি ও পরিবেশ

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'like begets like' অর্থাৎ সদৃশ থেকেই সদৃশের উৎপত্তি। এই ঘটনাটি মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছে। লক্ষ্য করে আসছে যে গোলাপের চারা থেকে যত ফুলই ফুটুক না কেন—সব কটিই গোলাপ ফুল হবে। গোলাপের গাছ থেকে জবা কি ডালিয়া ফুল কখনই পাওয়া যাবে না। এটা কেবল ফুলের বেলায়ই নয়, পশু-পাখী এমন কি মানুষের বেলাও তাই। অর্থাৎ সকলেই নিজের নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে যথা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই বংশ বিস্তার করে থাকে। মনোবিজ্ঞানে এই ঘটনাটিকেই 'বংশগতি' রূপে আখ্যাত করা হয়েছে। এই বংশগতির নিয়মকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নাই কারোরই।

এখন কথা হলো 'বংশগতি'র সম্পূর্ণ অর্থ কী? একটা জিনিস নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য করেছেন যে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ-ই এক রকমের নয়। বুদ্ধির দিক দিয়ে, বিচারের দিক থেকে, আচার-আচরণে, এমন কি চেহারায় পর্যন্ত মানুষে-মানুষে কত প্রভেদ আছে। কেন এই পার্থক্য বলতে পারেন? শুধু আপনি কেন, অনেকেই এই প্রশ্নে নিরুত্তর থাকবেন। অবশ্য এই ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরাও দিতে পারেননি। এই সমস্যা নিয়ে অনেক পরীক্ষাই করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। শেষ পর্যন্ত তাঁদের জয় সূচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছে বংশগতির কথা।

মানুষ ও জীবজগৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে দৈহিক ও মানসিক গুণাগুণের অধিকারী হয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে 'বংশগতি' বা 'বংশানুক্রম'। এমন কি গাছ-পালা, ফল-ফুল, পশু-পাখীর মধ্যেও এই বংশগতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, এ ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই। নানা-রকম বিরুদ্ধ মতবাদের সমাবেশও দেখতে পাওয়া যায়। তবুও এর মধ্যে যতটুকু বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে সেইটুকুই এখানে উল্লেখ করছি।

অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের জীবনের সূচনা হয় একটি ছোট্ট কোষের মধ্যে দিয়ে। একে বলা হয় জননকোষ বা জীবকোষ। এই জীব-কোষের মধ্যেই সুপ্ত হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ মানুষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাগুণ। দুটি নর-নারীর এই জীবকোষের পূর্ণ সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়েই ভাবী সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে যায় চিরদিনের মতো। ভবিষ্যতে সে দেখতে কেমন হবে? কোন কোন মানসিক গুণের উত্তরাধিকার পাবে? সমস্তই নির্ধারিত হয়ে যায় মা-বাবা উভয়ের জীবকোষের পূর্ণ সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবার কোষের বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট কণিকা যদি মায়ের কোষের ঐ বিশেষ ক্ষমতা বিশিষ্ট কণিকাকে স্পর্শ করে—তা হলে সাধারণতঃ শিশুর মধ্যে ঐ বিশেষ গুণটি বর্তায়। আবার বাবা অথবা মায়ের মধ্যে বিশেষ গুণগুলি বর্তায় পিতামহ ও পিতামহী অথবা মাতামহ ও মাতামহীর ঐ বিশেষ গুণ বিশিষ্ট কণিকাগুলির সংমিশ্রণের ফলে। এইভাবে শিশু মা ও বাবার মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বতন পিতৃ-মাতৃকুলের গুণাগুণ কিছু না কিছু পেয়ে থাকে। এই সমস্ত গুণাগুণ অনেক সময় দু'এক পুরুষ চাপা পড়ে থেকে আবার তৃতীয় পুরুষে দেখা দিতে পারে।

জীব বিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস গলটনের (Sir Francis Galton) মতে 'বংশগতি' সাধারণভাবে যে নিয়ম অনুসরণ করে তা হলো: 'বংশগতি'র আধাআধি ধারা পায় তার মা-বাবার কাছ থেকে। চার

ভাগের এ ভাগের অধিকারী হয় পিতামহ আর পিতামহীর কাছ থেকে। আর আট ভাগের এক ভাগ 'বংশগতি'র ধারা শিশুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীর গুণাগুণের 'ঝুলি' থেকে।

শিশু সমানভাবে মা-বাবার কাছ থেকে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাগুণের অধিকারী হয়ে থাকে। যে গুণটি মা-বাবা উভয়ের বা উভয় পরিবারের মধ্যে বর্তমান থাকে, সেটি শিশুর মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। এই সমস্ত গুণগুলি সমজাতীয়— সমধর্মী হতে পারে। আবার সমজাতীয় অসমধর্মীয়ও হতে পারে। যেমন মা-বাবা উভয়েই যদি দীর্ঘকায় হন, তবে সাধারণতঃ শিশু উভয়ের কাছ থেকে ঐ 'দীর্ঘতা' গুণটি পাবে এবং সে বড় হয়ে লম্বাই হবে। কিন্তু মা-বাবার মধ্যে যদি একজন খাটো হন—তবে শিশু খাটো কিংবা লম্বা হতে পারে। কিন্তু লম্বা হলে তার মধ্যে খাটো, আর খাটো হলে তার মধ্যে লম্বা ভাবটি রয়ে যাবে ভালো ভাবেই। ভবিষ্যতে সেই শিশুর যদি লম্বা কারো সঙ্গে বিয়ে হয়—তা হলে তার সন্তানেরা লম্বা হবে।

গায়ের রং-এর বেলায় যদি মা ফর্সা ও বাবা কালো হন—তা হলে শিশুর গায়ের রং সাধারণতঃ ফর্সা হবে। যদিও তার মধ্যে কালো ভাবটা থেকেই যাবে। চোখের রং-এর বেলায় দেখা যায় শিশু সাধারণতঃ বাবার চোখের রং-এর অধিকারী হয়। বাবার চোখের রং যদি কটা আর মায়ের চোখের রং যদি কালো হয়—তা হলে শিশুর চোখের রং কটাই হবে। যদিও তার ভেতর মায়ের চোখের কালো রং-এর ভাবটা থেকে যাবে।

শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির গঠন সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে মা-বাবা দু'জনেই যদি সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হন, তবে শিশু সাধারণ বুদ্ধির হয়ে থাকে। মা হীনবুদ্ধির হলে অর্ধেক সন্তানই হীনবুদ্ধির হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্না মা যদি হীন বুদ্ধি ঘরের মেয়ে হন…তবে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ হবে হীন বুদ্ধিদোষের বাহক। মা-বাবা দুজনেই যদি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন হন এবং হীনবুদ্ধি বংশের সন্তান হন…

তবে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ হবে হীনবুদ্ধি সম্পন্ন। মা-বাবা যদি হীনবুদ্ধির হন—তবে তাঁদের প্রত্যেকটি সন্তানই হবে হীন বুদ্ধির।

অনেক সময় আবার মানব পরিবারে সঙ্করত্ব দেখা যায়। যেমন মা-বাবার মধ্যে একজন কালো হলে—সন্তানদের রং এমন হতে পারে যাকে কালো কিংবা ফর্সা বলা চলে না। এই সঙ্করত্ব দৈহিক গঠন, আচার-আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে।

জীববিজ্ঞানে গ্রেগর জোহান মেনডেলের [Gregor Johann Mendel] আবিষ্কারকেই 'বংশগতি' সম্বন্ধে এক বিশিষ্ট আবিষ্কার বলা যেতে পারে। তিনি জীবজন্তুর মধ্যে এই গতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে সাদা গিনিপিগের সঙ্গে কালো গিনিপিগের সংমিশ্রণের ফলে জন্ম নেয় কালো গিনিপিগেরা। কিন্তু পরের পুরুষে ঐ গিনিপিগের বংশধরেরা রূপান্তরিত হয়—এক চতুর্থাংশ সাদায়, এক চতুর্থাংশ কালো আর বাকি সব ধূসর বর্ণে।

পরের পুরুষে আকৃতি ও রং বর্তানো সম্বন্ধে মেনডেলে আরও মজার মজার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'খরগোশ ও গিনিপিগের বেলায় কালো সাদার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, ফলে জন্ম নেয় কালো খরগোশ ও গিনিপিগেরা। গরু-মোষ গৃহপালিত পশুদের বেলায় শিং-হীন শিং-এর উপর ও ছোট পা বড় পায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে জন্ম দেয় শিং-হীন ও ছোট পা ওয়াল্য বাচ্চাদের। ঘোড়ার বেলায় লাল্‌চে, বাদামী—কালো অথবা রক্তাভ পীতের উপর এবং ধূসর অন্যান্য একক রং-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আর এর ফলে জন্ম হয় লাল্‌চে, বাদামী ও ধূসর রং-এর ঘোড়ার বাচ্চাদের। শূয়োরদের বেলায় কালো-লালের উপর আর সাদা অন্যান্য রং-এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। কুকুরের বেলায় কিন্তু ধূসর, কালোর উপর এবং যে কোনও একক রং মিশ্রিত রং-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে পথে-ঘাটে আমরা একক রং-এর কুকুরের বাচ্চা দেখতে পাই বেশী।

উদ্ভিদ্ জগৎ কিন্তু রং-এর ব্যাপারে প্রাণী জগতের ধারাটিকে হুবহু অনুসরণ করে চল্‌ছে না। প্রথম সাদা ও লাল ফুলের পরাগ সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় গোলাপী রং-এর ফুলের। এর পরে সৃষ্টিতে বংশধরেরা হয়— এক চতুর্থাংশ লাল, এক চতুর্থাংশ সাদা আর বাকী অর্ধেক গোলাপী। ধর্মযাজক মেনডেলের মতে ফুলের বংশগত গুণগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রকট আর প্রচ্ছন্ন। একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন গুণের সমাবেশ ঘটলে প্রকট গুণটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ও প্রচ্ছন্ন গুণটি বিকশিত হতে পারে না। একটিকে বলা যেতে পারে সম্ভাবিত আর অপরটি হলো সম্ভাবনা। যদি লাল রংটি প্রচ্ছন্ন আর নীল রংটি প্রকট হয় তবে রক্ত কমলের সঙ্গে নীল কমলের সংমিশ্রণে যে গাছের সৃষ্টি হবে—তাদের সবগুলিতেই নীল কমল ফুটবে। কিন্তু এই নীল কমলগুলি নিষিক্ত হলে যে ফুল ফুটবে তাদের চার ভাগের এক ভাগ প্রতিবারই বিশুদ্ধ নীলের সৃষ্টি করবে। আর তিন ভাগের একভাগ থেকে সব সময়ই বিশুদ্ধ রক্ত কমলের সৃষ্টি হবে। অবশিষ্ট দু'ভাগ নীল থেকে যে সব ফুল ফুটবে তাদের চার ভাগের একভাগ থেকে সব সময়ই অবিমিশ্র নীল কমলের উৎপত্তি হবে। বাকি তিন ভাগের একভাগ থেকে বংশপরম্পরায় রক্ত কমলের সৃষ্টি হবে।

সব শিশুই তার মা-বাবার অথবা পূর্বপুরুষদের কতকগুলি গুণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তবে তার এই গুণাগুণের কতগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকের উপর। পরিবেশ অনুকূল হলেই শিশুর বংশের গুণাগুণগুলি পূর্ণতা পায় আর বিরুদ্ধ পরিবেশে সেগুলি পরিস্ফুট হবার সুযোগ পায় না মোটেও। গোলাপের চারা থেকে গোলপই ফুটবে ভুঁইচাঁপা কখনও ফুটবে না। এটাই হলো গোলাপের বংশগতি। রং-এর ব্যাপারটি তো আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু গাছটিতে দু'একটি গোলাপ ফুটবে কি রাশি রাশি গোলাপ ফুটবে—সেটা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর। অর্থাৎ যেখানে গাছটি আছে—তার মাটির উর্বরতা, জল-হাওয়া-উত্তাপের

প্রচুরতার ওপর। যে শিশু জড়বুদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে কখনও তীক্ষ্ণ ধী ক'রে তোলা সম্ভব হবে না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে তার মধ্যে যতটুকু বুদ্ধি সুপ্ত আছে সেটাকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলা যেতে পারে মাত্র!

এখানে কথা হলো চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে কোন্‌টি প্রভাব বিস্তার করে—'বংশগতি' না 'পারিপার্শ্বক'? এর উত্তরে 'বংশগতি' ও 'পারিপার্শ্বিক' বাদীদের কথা বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হতে হয় যে উত্তরাধিকার সূত্রে শিশু যে গুণ পায় তার মা-বাবা ও ঊর্ধতন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেটাই পরিপূর্ণ রূপ নেয় উপযুক্ত পারবেশ ও পারিপাার্শ্বকের প্রভাবে। সম্ভাবনা যেখানে মোটেই নেই, সেখানে পারিপার্শ্বিক ভালো হলেও তা থেকে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না।

মা-বাবার অর্জিত গুণ সন্তানে বর্তায় কিনা এই নিয়ে প্রায়ই অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয় আমাদের। তবে ঐ প্রশ্নের উত্তরে বেশ পরিষ্কার ভাবে 'না' কথাটি বলা চলে। তার কারণ ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয় অর্জিত গুণের ফলে নয় —শুধু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। রাঁধায় পটু বা সেলাইয়ে দক্ষ মায়ের মেয়ে অনেক সময়েই ভালো রাঁধুনী অথবা সেলাইয়ে দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না, তারা সে গুণটি পায় বেশীর ভাগ পারিপার্শ্বিকের সহায়তায়। মোটের উপর 'বংশগতি' ও 'পারিপার্শ্বক' ছুটোই প্রাণীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। তাই চলতি প্রবাদ হলো—'গাধা পিটিয়ে কখনও ঘোড়া করা যায় না।'

পারিবারিক গুণের উত্তরাধিকার ছাড়াও শিশু আর একরকম গুণের উত্তরাধিকারী হয়। যা হলো তার জাতীয় উত্তরাধিকার। জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে শিশু পায় ভাবী জীবনে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস ও কৃষ্টি প্রভৃতির উত্তরাধিকার। একটা জাত যুগ যুগ ধরে এই 'বংশগতি'র প্রভাবেই এগিয়ে চলে।

একই পরিবারের দু'টি সন্তানকে যদি দুটো আলাদা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে তারা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। আবার একই পরিবারের ও একই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েও তারা ভিন্ন গুণের অধিকারী হয়। তার কারণ হলো, শিশুর পরিবারে স্থান অনুসারে তার সামাজিক পরিবেশেরও বদল হয়। একই পরিবারে বড়ো, মেজো, সেজো ও ছোট প্রভৃতি পরস্পরের সম্বন্ধ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে। এই কারণেই অনেক সময় সহোদর ভাই ও বোনেরা এক প্রকৃতির ও এক রুচির হয় না। চেষ্টা, যত্ন ধৈর্য ও সহানুভূতি থাক্‌লে যে কোনও অভিভাবক-অভিভাবিকা তার ছোট্ট ছেলেটিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুল্‌তে পারেন। অবিশ্যি অনেক অভিভাবকই অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর নিজের ছেলেটিকে মানুষ করে গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে পারেন না। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই বিদেশের মতো আমাদের দেশেও নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা হচ্ছে। শিশু শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেওয়ার জন্যই এই নার্সারী স্কুলের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এদিকে ছোটদের মানুষ করার ব্রতে এগিয়ে আসছেন নার্সারী স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও অন্যদিকে মনের আনন্দকে বজায় রেখে আসল ও খাঁটি মানুষ করে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন আমাদের দেশের কয়েকটি শিশু সংগঠন। এটাই হলো আমাদের দেশের ভাবী মানুষদের কাছে সব চাইতে বড় আশার কথা।

শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি

মানুষ যখন ছোট্ট শিশু রূপে জন্ম নেয় এই পৃথিবীর বুকে তখনই সে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বাভাবিক প্রেরণা নিয়ে আসে। তার দেহ ও মন পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাড়া দেয়। এর জন্য তার কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। কোন্ পরিবেশে শিশু কি ধরনের আচরণ করবে—সেটা নির্ভর করে তার দেহ-মনের স্বাভাবিক গঠনের উপর। শুধু শিশুই নয়, প্রত্যেক মানুষের এবং প্রাণীর অধিকাংশ কাজের পেছনে আছে এই সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা। খিদে পেলে অধিকাংশ প্রাণীই আহার সামগ্রীর অন্বেষণ করে। ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও খিদে পেলে কান্না দিয়ে তাদের খাওয়ার ইচ্ছাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

শিশুর কান্নাকে অধিকাংশ সময়েই তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বলা যেতে পারে। গরম কিংবা শীতে অস্বস্তি বোধ করলেই তারা কান্না জুড়ে দিয়ে তা থেকে মুক্ত হতে চায়। অনেক শিশু আবার পায়খানা প্রস্রাবের আগে কেঁদে মা-বাবাকে সাবধান করে দেয়। এই সময়ের অভ্যাস করালে তারা কাগজে পায়খানা ও বাইরে শিস্ দিয়ে প্রস্রাব করতে শেখে। সহজাত প্রবৃত্তির ফলে শিশু হাত-পা নাড়ার মধ্যে দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা করে। আর আঙ্গুল চোষার সহজাত প্রবৃত্তিকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বর্ণনা করেছেন শিশুর মধ্যে সহজাত কাম প্রবৃত্তির তাড়না বলে। অন্য একজন মস্ত বড় মনোবিজ্ঞানী পাভ্লভ্ অবশ্য ফ্রয়েডের এই মতবাদকে মোটেই আমল দেননি। তাঁর মতবাদ আবার অন্যরকম।

অন্যের কাছে প্রত্যেকই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অধিকাংশ প্রাণীই নিঃসঙ্গ-জীবন অপেক্ষা দলগত জীবন পছন্দ করে। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলেই বোধকরি শ্রেষ্ঠ সমাজবদ্ধ জীব। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে। বংশবৃদ্ধি অথবা রমণেচ্ছা হলেই পশু, পাখী এমন কি মানুষ স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমের জন্য মিলিত হয়। বাচ্চা প্রসবের সময় আসন্ন হলে পশু-পাখীরা নিজের বাসা বা নীড় রচনায় ব্যাপৃত হয়ে থাকে। মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আহার করে। এমন কি এই সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় পশু-পাখী বধেও কুণ্ঠিত হয় না। নানান্ জিনিস হাতের কাছে পেলে তা কৌতূহল বশে নাড়াচাড়া করে দেখে। অপরের প্রশংসায় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অন্য আর একটি শিশুর সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে। অনুকরণ প্রিয়তাই তাদের 'ঘর-বাড়ি' খেলার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজে বাবা সেজে অন্যের ওপর খবরদারী করতে খুবই ভালোবাসে। শিশুর বেশীরভাগ আচরণের পেছনেই যে অভিজ্ঞতা নেই, আছে শুধু স্বাভাবিক প্রেরণা তা একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে দুই ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো আত্মগত প্রবৃত্তি ও দ্বিতীয়টি হলো জাতিগত প্রবৃত্তি। খেলাধুলো, অনুকরণ, প্রশংসাপ্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রকাশ, ক্রোধ, ভয়, প্রেম ও আহারের মধ্যে যে প্রবৃত্তি কাজ করছে তাকে বলা যেতে পারে আত্মগত প্রবৃত্তি। শিশুও জানে নিজেকে রক্ষার জন্য তার আহারের প্রয়োজন—তাই সে আহারের জন্য কাঁদে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। অনুকরণের মধ্য দিয়েই সমাজজীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে।

জাতিগত প্রবৃত্তির তাড়নাতেই জাতিতে জাতিতে বিভেদ, যুদ্ধ ও মানুষ ধ্বংসের প্রেরণা আসে। আমার জাত অন্য জাত থেকে শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর অন্যান্য জাত থেকে আমরা অনেক সভ্য—এই যে মনোভাব, তার ফলেই সংহতি আসে। আসে অন্যকে সহ্য করার প্রেরণা। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে ইজম্‌রূপী সাম্রাজ্যবাদ। এছাড়া জাতিগত প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে

যৌন প্রবৃত্তি, সমাজ-প্রীতি, সহানুভূতি ও সন্তান বাৎসল্য প্রভৃতি।

রূপ নিয়ে, আভরণ নিয়ে ও নিজেদের সম্পদ নিয়ে পল্লীর নিভৃত জলের ঘাট থেকে আরম্ভ করে নগরীর রাজপ্রাসাদে, এমন কি চায়ের আসরেও চলে প্রতিযোগিতা। শহরের পথে-ঘাটে, পল্লীর মেলায় তাই দেখা যায় নিজেকে বড় করার প্রতিযোগিতা। অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার এই যে প্রবৃত্তি তাও স্বাভাবিক। একটি বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা রয়েছে তাও আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। শিশুর মধ্যেও যে প্রতিভা ও বিশিষ্টতা ঘুমিয়ে আছে তাও চাইছে সুযোগ পেলেই জেগে উঠ্‌তে। পরিবেশও চাইছে সেই সুপ্ত বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তুল্‌তে। শিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞানের বাইরে যে ঘটনাগুলি চলেছে তাকে সহজাত প্রবৃত্তির কাজ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

কৌতূহল জাগার মধ্য দিয়েই শিশু নিজেকে জান্‌তে পারছে। হতে পারছে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন। আবার ভয় জাগার মধ্য দিয়েই শিশু পাচ্ছে আত্মরক্ষার রক্ষা-কবচকে। অনুকরণ স্পৃহা এনে দিচ্ছে শিশুর মধ্যে সমাজজীবনের চেতনাকে। ক্রোধ, ঈর্ষা ও রোষ শিশুর মধ্যে জাগাচ্ছে আত্মবিকাশের প্রেরণাকে।

শিশুর মধ্যে সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তিগুলি একসঙ্গে নাও দেখা দিতে পারে। দেহ ও মনের গঠন যতই পূর্ণতর হতে থাকে ততই তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির বিকাশও বেশী পরিমাণ দেখা যায়। যত দিন না শিশু হাত-পা নাড়তে শেখে ততদিন পর্যন্ত তার কৌতূহল প্রকাশ পায় না। আবার কৌতূহল প্রকাশ পেলে সে নতুন নতুন সঞ্চালন পদ্ধতি দিয়ে তার আনন্দকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। যেমন যৌবনে মানুষ যৌনসম্ভোগের মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ আস্বাদন করে শিশু তার দেহের কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে সেরকম আনন্দের স্বাদ পেতে চেষ্টা করে। যৌনসম্ভোগ সম্পূর্ণ অজানা থাকা সত্ত্বেও শিশু ঐ প্রেরণা পায় তার সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে। অবশ্য এখানেও পাভলভ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

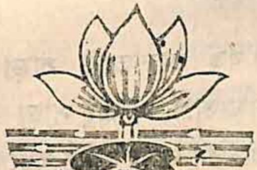
সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুকে সমাজপ্রীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মা-বাবার প্রতি অন্ধ আসক্তি ও নির্ভরশীলতা কমে আসে ও সমাজের সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে তার সঙ্গীদের বুঝতে শেখে। খারাপ এবং শত্রুপক্ষীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকার প্রেরণাও পায়। সমাজে থাক্‌তে হলে যে-সমস্ত গুণের প্রয়োজন তাও বুঝতে ও জান্‌তে শেখে—এই মেলামেশার মধ্য দিয়ে সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই। নিজেকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবৃত্তি আসে শিশুর মধ্যে অন্য শিশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানা রকম দুঃসাহসিক কাজের মধ্য দিয়ে। এই ভাবে এই সহজাত প্রবৃত্তিই শিশুকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলে।

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির পরস্পর বিরোধী ভাবধারাকে এড়িয়ে চল্‌তে বলেছেন। তাঁরা সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও মানুষকে অন্যের হাতে যাতে উৎপীড়িত হতে না হয় সেই প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়েছেন। সমাজকল্যাণমূলক সমস্ত প্রবৃত্তিই প্রশংসার যোগ্য একথা বলেছেন। আবার দৃঢ়স্বরে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি ও অন্যকে পীড়ন করার প্রবৃত্তিকে যত্নের সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যেতে বলেছেন। ধ্বংস করার প্রবৃত্তি শিশুকালেই মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধে। পশু-পাখী, কীটপতঙ্গকে আঘাত করার মধ্য দিয়ে, বাসা বাঁধে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ও মারধোর করার প্রবৃত্তি। অনেক শিশুর মধ্যে সমস্ত কিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলার এক বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি শৈশবে উৎসাহ পেলে তার থেকেই ধ্বংসের প্রবৃত্তি ও অন্যকে পীড়নের প্রবৃত্তি জাগে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে শিশুর এই প্রবৃত্তিগুলিকে সুপরিচালিত করা যেতে পারে।

যার মধ্যে ধ্বংসের প্রবৃত্তি প্রবল—তাকে যোদ্ধা তৈরী করতে পারলে তা সমাজজীবনে সুফল আনে। সে প্রকৃত বীর যোদ্ধা হয়ে দেশকে অন্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ও শত্রু নাশের ফলে সে নিজের ধ্বংস-প্রবৃত্তিকেও পরিতৃপ্ত করতে পারে। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী

হলেও সে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে খুব আনন্দ পায়। অথচ তার ঐ প্রবৃত্তির ফলে সমাজ বিধ্বস্ত না হয়ে উপকৃত হয়।

তাই শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খেলাধুলা ও প্রচুর আনন্দের মাধ্যমে সু-নাগরিক করে গড়ে তোলার ব্রত নিতে হবে প্রত্যেক মা-বাবার। সমাজজীবনের সুসংবদ্ধ কর্মধারার অভ্যাস ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের গুণাগুণগুলি সম্বন্ধে শিশুকে সচেতন রেখে তার ভবিষ্যৎ গড়ার কর্মধারাকে রূপ দিতে হবে। পরিবেশ ও মা-বাবার সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে শিশুর মধ্যে তার পূর্ব পুরুষদের গুণাগুণগুলি বিকশিত হয়ে উঠবে ও শিশুটি গড়ে উঠ্‌বে একটি পূর্ণ এবং আদর্শ মানুষ রূপে।



শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি

মস্তিষ্কই হলো মানুষের সমস্ত প্রতিভার উৎস। আবার মনটি হলো মানুষের সবচাইতে আপনার জিনিস। এই মস্তিষ্ক এবং মন সম্বন্ধে অবশ্য আমরা খুব কমই জানি এবং এ সম্বন্ধে ভাবিও কম। আবার মনের রয়েছে দুটো ভাগ। একটা হলো চেতন মন আর অন্যটি হলো অবচেতন মন। আমাদের সমস্ত কিছু কাজ, চেষ্টা এবং চিন্তা নির্ভর করে এই দুই মনের সম্বন্ধের উপর। যখন আমরা নতুন করে কিছু শিখি, ভাবি অথবা দেখি—সেটা তখন অবচেতন মন মারফৎ চেতন মন গ্রহণ করে থাকে। আবার আমরা যখন কোনও প্রশ্ন পাই তখন এই অবচেতন মনই সাড়া জাগায় সবচাইতে আগে। তারপর আসে উত্তর জানাবার পালা।

এই অবচেতন মন যত তাড়াতাড়ি সাড়া জাগায় কোনও কিছুর মীমাংসাও আসে তত তাড়াতাড়ি। এই সাড়া জাগানোর সময়টি কিন্তু নির্ভর করে চেতন ও অবচেতন মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপর। যে লোকের বেলায় এই সম্পর্কটি যত বেশী গভীর, আমরা তাকেই তত বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করে থাকি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী বিজ্ঞানী বোভিস আঠাশ বছর ধরে এই চেতন আর অবচেতন মনের সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণার ফল হিসেবে বলেছেন: 'একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে অবচেতন মনের সাড়া জাগাবার ক্ষমতাটাই হলো মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং এটাকেই বুদ্ধি-বৃত্তি বলা যেতে পারে বলে আমি মনে

করি।' এই কার্যকারিতা অথবা বুদ্ধি-বৃত্তি পরিমাপ করার জন্য তিনি একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন।

ডক্টর অস্কার ব্রুনলারের গবেষণালব্ধ ফল হলো ঃ 'প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক থেকে এক রকম বিকিরণ সমস্ত সময় চলেছে। এই যে অদ্ভুত বিকিরণ, এর রয়েছে একটা বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ অর্থাৎ Wave length। এই বিকিরণ এককের নাম হলো ডিগ্রি বায়োমেট্রিক (Biometric)। এই বিকিরণ সমস্ত সময়ই নির্ভর করে মানুষের প্রতিভার উপর।' ডক্টর ব্রুনলার প্রায় ১১,০০০ জন লোককে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর সেই পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তির উপরই সমস্ত পৃথিবীর লোকেদের সাজিয়েছেন। তা হলো ঃ

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা	৭৮০ জন,
আসাধারণ মেধা	৬৪০ জন,
অপূর্ব ব্যক্তিত্ব	৫০০ জন,
বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্	৪৪০ জন,
তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন	৪০০ জন,
বুদ্ধিজীবি	৩৬০ জন,
বাস্তববাদী	৩০০ জন,
সাধারণজ্ঞান সম্পন্ন	২৪০ জন,
স্বল্পবুদ্ধি	২২০ জন,
বিকৃতমনা	২০০ জন,
নির্বোধ	১৮০ জন

এ ছাড়া আর বাকি সকলেই হলো মিশ্রিত বুদ্ধির লোক

মানব শিশু জন্ম নেয় বিশেষ কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক সম্পদ নিয়ে। এক শিশুর সঙ্গে আর এক শিশুর তাই সমস্ত বিষয়ে সাদৃশ্য কখনই চোখে পড়ে না। শারীরিক পার্থক্যটাও এই কারণেই। কারণ শরীরের সঙ্গে মনের রয়েছে বিশেষ যোগাযোগ। প্রায় সমস্ত মনো-বিজ্ঞানীরই ধারণা যে শারীরিক গঠনের পার্থক্যই সমস্ত মানুষের মধ্যে

মনের পার্থক্যেরও কারণ। এটা দেখা দেয় শৈশবেই। তাই শিশুকাল থেকেই তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য এক বিশেষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তার জন্য চাই সুযোগ্য গুরুও। সকলের বুদ্ধিবৃত্তি আবার ঠিক একভাবে কাজও করে না। অনেকের বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ কাজ করে কিন্তু সমস্যা বা দুর্ভাবনায় পড়লে একদম কাজ করতে চায় না। তখন তাঁরা মুষড়ে পড়েন এবং চোখে দেখেন অন্ধকার অথবা সর্ষেফুল। আবার বিপরীত ধরনের লোকও এই পৃথিবীতে দেখা যায়। তাঁদের চিন্তাশক্তি খুবই প্রখর। প্রত্যেক মানুষই একটা না একটা সাধারণ গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাই কেউ হন সাহিত্যে পারদর্শী আবার কেউ বা বিজ্ঞানে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যেই বিশেষ গুণ ও জ্ঞান জন্ম নিতে শুরু করে। আবার বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিক বিশেষ ভাবে শিশুর এই গুণগুলিকে বাড়তে সাহায্য করে। একটি শিশুই উত্তরকালে স্বনামধন্য হয় অথবা কীর্তি রাখে এই বিশেষ গুণগুলির ক্রমোন্নতির ফলেই। এই সমস্ত বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী টমসন, বার্ট, থর্নডাইক প্রভৃতির গবেষণালব্ধ ফলই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধির পরিমাপের উপায় সম্বন্ধে অধ্যক্ষ বিনেট একটা বিশেষ সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের সাধারণতঃ দুটো বয়স আছে। একটা হলো দেহের বয়স আর একটা মনের। প্রত্যেক বয়সেরই কার্যকারিতা, আচার-আচরণ এবং সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই নিশ্চয়ই একটা ধারণা থাকা উচিত। কোনও ছেলে যদি তার স্বাভাবিক বয়সের মত আচরণ না করে অধিক বয়স্ক ব্যক্তির মত আচরণ করে তবে তাকে 'ঢ্যাকামি' বা 'পাকামি' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার তেমনি যদি কেউ তার আসল বয়সের চাইতে কম বয়সী ছেলের মত আচরণ করে তবে তাকে বলা হয়—'ছেলেমানুষী'।

পরীক্ষার শুরুতেই কোন বয়সের উপযোগী আচার-আচরণ কেমন

হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করে নিতে হয়। এই থেকেই দেহের বয়স ও মনের বয়সের মধ্যে একটা সমতা সম্পন্ন সম্পর্ক পাওয়া যায়। এই দেহের বয়স ও মনের বয়সের অনুপাতের শতকরা হিসেবই হলো বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ Intelligence quotient। প্রত্যেক মানুষের মনের ও দেহের বয়স সমস্ত সময়ই সমান হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাতেই বুদ্ধিবৃত্তি হলো পুরোপুরি ১০০।

এই বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষাটি কিন্তু খুব সহজ নয়। দু'রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একরকম 'মৌখিক' আর অন্যটি হলো 'লিখিত'। শিশুকে কোনও একটি বিশেষ প্রশ্ন করা হল। আর এই প্রশ্ন করার পর থেকে উত্তর পাওয়া পর্যন্ত সময়টি লক্ষ্য রাখা হলো। কোনও ছবি বা খেল্‌নার বিভিন্ন অংশগুলি শিশুকে সরবরাহ করা হলো। আর এটিকে সম্পূর্ণ করতে তার কতটুকু সময় লাগল সেটাও লক্ষ্য করা হল। আবার কতকগুলো সংখ্যা পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যের পার্থক্য শিশুকে বার করতে বলা হলো। একই ধরনের কতকগুলি জায়গার নাম করতে বলা হলো ইত্যাদি। এইভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর কার্যকারিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করা হল। আগেই প্রত্যেকটি প্রশ্নে নম্বর ঠিক করে নিয়ে উত্তর পিছু নম্বর দেওয়া হলো। মনের বয়সের মোটমাট কত নম্বর হল তার সঙ্গে দেহের বয়সের একটা তুলনামূলক মান নির্ধারণ করে তা থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয় শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ intelligence quotient।

$$\left(IQ = \frac{\text{Mental age}}{\text{Chronological age}} \quad \text{অর্থাৎ} \ \frac{\text{মনের বয়স}}{\text{দেহের বয়স}}\right)$$

অবশ্য স্বাভাবিক উপায়ে যে সমস্ত নীতি আমরা মেনে চলি তার আবার বিপরীতটিও খুবই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সাধারণভাবে 'Morning shows the day' হলেও আবার সমস্ত সময়ই ভোরের আবহাওয়া দেখে সারাদিনের আবহাওয়া ঠিক করা যায় না। তেমনি

যে শিশু এই পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল দেখালো কার্যক্ষেত্রে সে হয়তো খুব কীর্তিমান পুরুষ হিসেবে দেখা দেয়।

একই মা-বাবার দুই সন্তান। একটি ছেলে অন্যটি মেয়ে। তারা তো একই বংশগতি পেলো তার মা-বাবার কাছ থেকে। পারিপার্শ্বিক তাও তাদের হলো এক। কিন্তু তারা কি পরস্পর একই বুদ্ধিবৃত্তি পাবে? আবার তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কতটুকুই তফাৎ হবে তাদের মা-বাবার চাইতে? এই প্রশ্নের সমাধানে প্রায় ৫০টি পরিবারের ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। ঐ পরীক্ষা থেকে এই ফলগুলিকে মেনে নেওয়া যেতে পারে ঃ

১) প্রায় সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বুদ্ধিবৃত্তিতে পরস্পর থেকে ভিন্ন ধরনের হয় এবং সমস্ত পরিবারেরই মা-বাবাকেও সাধারণতঃ সন্তানের চাইতে বুদ্ধিবৃত্তিতে তফাৎ দেখা যায়।

২। বুদ্ধিবৃত্তিতে চৌখস মা-বাবার সন্তানও সাধারণতঃ চৌখস প্রকৃতির হয়।

৩। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মা-বাবার সন্তানই সাধারণতঃ অল্পবুদ্ধির হয়ে থাকে।

শৈশবে ছেলেটি অথবা মেয়েটির বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা করে নিয়ে যদি মা-বাবা এগিয়ে চলেন তবে অনেক সময়ই ভালো ফল দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন এবং উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে অনেক সময়ই ভীরু, জড়বুদ্ধি, শিথিল প্রকৃতির এবং অল্পবুদ্ধির ছেলেমেয়েরা সমাজে দশজনের একজন হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা না হলে তারাই একদিন হয়ে দাঁড়ায় সমাজের বিষফোড়া!

শিশুর স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তি মানবজীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। এর সাহায্যেই আমরা অতীতের অনেক কথা মনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে থাকি। শেখা, মনে ধরে রাখা এবং পরে তার যথাযথ প্রকাশই হলো স্মৃতিশক্তির কাজ। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ভুলে যাওয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'মানুষের ভেতরে দু'টি মন কাজ করছে। একটি তার হুঁসিয়ার মন, অন্যটি বেহুঁস মন। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলে চেতন আর অবচেতন মন। মানুষের যা কিছু মনে থাকে তা হলো—এই চেতন মনের জন্য আর যা কিছু ভুল হয় তা এই অবচেতন মনের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কান্নার মধ্যে দিয়ে প্রথম স্বরযন্ত্রের ব্যবহার করতে শেখে। জন্ম ক্রন্দন বা 'Birth cry' শিশুর স্বাভাবিক জন্মগত প্রক্রিয়া। চার মাস বয়স থেকেই শিশু আবল-তাবল বকতে শুরু করে। এটা চলে নয় মাস পর্যন্ত। একেই বলে 'শৈশব কাকলি'। সাধারণতঃ শিশু দু'টি বছর পার হবার পর সুষ্ঠুভাবে বাক্যের আধো-আধো ব্যবহার করতে শেখে। তখন থেকেই শুরু হয় তার স্মৃতিশক্তির কাজ।

তারপর একটু বড় হলে খুব সহজেই মনে থাকে খেলার কথা—কোথায় তাদের খেলনাগুলো আছে। তারপর আর একটু বড় হলে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম। বিশেষ খেলাগুলির তারিখ এবং সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতাদের নাম ইত্যাদি। পড়াশুনোর ব্যাপারে প্রথম প্রথম একটু তাদের গাফিলতি দেখা যায়। কিন্তু উপযুক্ত

শিক্ষক অথবা মা-বাবা তাঁদের বিচক্ষণতা দিয়ে শিশুর শিক্ষার ধারাকে এমন ভাবে নিয়ে চলেন—যা থেকে তাদের পড়াশুনোর বিষয়গুলি মনে রাখার জন্যও আগ্রহ জন্মায়।

মনে রাখা অথবা স্মৃতিশক্তির ব্যবহারের কথার সঙ্গে শিশুর ভুলে যাওয়ার কথাটি বিশের ভাবে জড়িত আছে। কারণ ভুলে যাওয়াটা মানুষের একটা বিশেষ স্বভাব ধর্ম। অবশ্য ইচ্ছে করে কেউ ভুলে যায় না বা যেতেও পারে না। সারা বছর মন দিয়ে কষ্ট করে পড়ে পরীক্ষার সময় মনের মতো উত্তর লিখতে না পারার মূলেও কিন্তু এই 'ভুলে যাওয়া'ই কাজ করছে। এই ব্যাপারে আমরা যথাযথ কোনও ব্যবস্থা করি না বলেই তো অজেকের দিনে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার পাসের হার ক্রমাগতই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন ঃ 'যা মানুষের মনের কোণে কোনও রেখাপাত করে না সেইটিই সে পদে পদে ভুলে যায়।' অতি দরকারি বাড়ির অথবা অফিসের চাবি হাতের কাছে গুছিয়ে রেখে প্রায়ই আমরা তা খুঁজে পাই না। পেন্সিল, খাতা, কলম খুঁজে না পাওয়ার জন্য ছোটদের সমস্ত সময়ই বড়দের কাছে গালমন্দ খেতে হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যে বেলা পড়ার সময় বইটি খুঁজে বার করা ছোটদের একেবারে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই সব কিছুর মূলেই কিন্তু রয়েছে অমনোযোগিতা। তাই মনে রাখার সবচাইতে ভালো উপায় হলো, ছেলে বা মেয়েটিকে সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী করে তোলা।

অবশ্য অনেক সময় ভয় পেলে অথবা ভয়ের কোনও কারণ থাকলে ছোটরা ভুলে যায়। ভয় পেলে শুধু ছোটরা কেন অনেক বড়রাই নিজের নাম এমন কি বাবার নাম পর্যন্ত ভুলে যান। তাই তো চলতি কথায় গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়—'বাবার নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।' তাই ছোটবেলা থেকেই যদি ছেলে বা মেয়েকে ভয়ের যে সমস্ত স্বাভাবিক কারণ আছে সেগুলি বুঝিয়ে দেওয়া যায় তবে তারা অযথা ভয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে এবং ভবিষ্যতে এই ভুলে যাওয়ার হাত থেকেও রেহাই পায়।

ভুলে যাওয়াটা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময় বিশেষ কষ্টের এবং বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন একটা কথা সুন্দর ভাবে গুছিয়ে নিয়ে সকলের কাছে যেই মাত্র বলতে যাচ্ছেন তক্ষুণি একেবারে বেমালুম ভুলে গেলেন। তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় বলুন তো? সব চাইতে বেশি ভুল হয় ছাতা বা ছড়ি নিয়ে চলার সময়। বৃষ্টি যদি থাকে তবে হয়তো ছাতার কথা মনে রইল—নয়তো ট্রামে কিংবা বাসে রয়ে গেল আপনার প্রিয় ছাতাটি। আবার অনেক সময় পথে বেরিয়ে আমরা কোথায় চলেছি সে কথাটি বেমালুম ভুলে যাই। এই জন্যেই অনেক সময় ট্রামে বা বাসে কণ্ডাক্টরকে কোথায় যাচ্ছি তার ঠিক নিশানা দিতে পারি না। ফলে অনেকের অবহেলার কথা শুনতে হয় 'লোকটার কি ভুলো মন হে!'

ভুলে যাওয়াটা যেমন প্রায় সময়েই আমাদের বিপদে ফেলে কিন্তু অনেক সময়ে আবার আমাদের রক্ষাও করে অনেক দুঃখের হাত থেকে। পুরোন ঘটনাগুলি যদি সব সময় আমাদের মনকে ঘিরে থাকত তবে নতুনকে নতুন বলে গ্রহণ করতাম কী করে? আবার আমাদের দুঃখের স্মৃতিগুলি যদি অন্তরে সমস্ত সময় জেগে থাকত তবে আনন্দের দিনে আনন্দ করা আমাদের ভাগ্যে জুটতো না কক্ষনো। তাই তো বলি চেতন মনের সঙ্গে সঙ্গে অবচেতন মনও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে জীবনে চলার ছন্দে। এই ভুলে যাওয়ার হাত থেকে ছোটরা অর্থাৎ আমাদের ভাবীকালের পথ যাত্রীরা রেহাই পেতে পারে কী করে? কী করলে বিশেষ জরুরী জিনিসগুলি তারা স্মৃতির পথে জাগিয়ে রাখতে পারে? মনোবিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে এই প্রশ্নগুলির সমাধান করে দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'স্মৃতিশক্তি' বাড়াবার ও ক'টি পন্থার কথা বলেছেন। এ গুলি মনে রেখে ছোটদের চালনা করতে পারলে নিশ্চয়ই ভাবীকালে ভালো ফল আশা করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানীদের অনুসরণীয় কথা ক'টি হলো:

১। ছোটদের অত্যধিক মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম থেকে দূরে রাখা।

২। সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মন গড়ে তুলতে ছোট বেলা থেকেই সাহায্য করা।

৩। ভুলে যাওয়ার মুহূর্তে ছোটরা যাতে ঘাবড়ে না যায়—সে শিক্ষা।

৪। হঠাৎ যাতে কোনও ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে না পড়ে—সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

৫। মনে প্রচুর উৎসাহ এবং আনন্দ নিয়ে যাতে সমস্ত সময় কাজ করে—তার ব্যবস্থা করা।

৬। মনের জটিল বিষয়গুলি যাতে ওরা মনের ভেতর চেপে না রাখে—তার চেষ্টা।

৭। মানসিক শান্তি এবং সুস্থতা বজায় রাখার মতো আবহাওয়ায় শিশুদের মানুষ করে তোলার ব্যবস্থা।

৮। নিজের আত্মবিশ্বাসের উদাহরণ দিয়ে শিশুকে আত্মবিশ্বাসের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

'স্মৃতিশক্তি'কে বাড়াবার জন্য যে পন্থাটি খুবই কার্যকরী তা হলো 'স্মৃতি-শক্তি'র পরীক্ষা। মাসে একবার অথবা দু'মাস অন্তর একবার এই পরীক্ষার সাহায্যে ছোটদের 'স্মৃতিশক্তি'র উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব এবং তাতে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। প্রক্রিয়াটি হলো এই রকম ঃ ছোটদের সামনে কতকগুলি জিনিস রাখতে হয় যা তারা সহজেই চিন্‌তে পারে। যেমন ধরা যাক্—একটি পেন্সিল, একটি চক্‌খড়ি, একটি কলম, একটি কোট, একটি খাতা ও একটি লাল রং-এর বই ট্রেতে সাজিয়ে ছেলেটির বা মেয়েটির সামনে রাখা হলো দু'তিন মিনিটের জন্য। পরে সেটা সরিয়ে ফেলে ওদের লিখতে দেওয়া হলো—কী কী জিনিস ট্রেতে ছিল। 'এর জন্যও তিন মিনিটের মতো সময় দেওয়া হলো।

যদি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা যা ছিল তা তা ঠিক ঠিক ভাবে লিখতে পারে তবে পরের পরীক্ষায় জিনিসের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে 'স্মৃতিশক্তি'কে বাড়িয়ে তোলার পরীক্ষা শিশুদের শিক্ষা-সূচীর মধ্যে থাকলে—তার থেকে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

এছাড়া ছোটদের মাঝে মাঝে দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ও সেখানকার সমস্ত দর্শনীয় জিনিসগুলি ভালো করে গুছিয়ে গল্পাকারে বুঝিয়ে দেওয়া এবং বাড়ি ফিরে এসেই ওরা যা যা দেখেছে তার বিস্তৃত তালিকা ওদের নিয়েই তৈরী করিয়ে নেওয়া ও পরে এ সম্বন্ধে তাদের প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া প্রভৃতি। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ওদের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করতে পারলে ছোটদের 'স্মৃতিশক্তি'কে খুব বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় ও ভাবীকালে তারা মনের ভাবটিকে খুব সুন্দর ভাবে রূপ দিতে সক্ষম হয়। আর এদের মধ্যে থেকেই অনেকে খুব তীক্ষ্ণ 'স্মৃতিশক্তি'র অধিকারী হয়ে থাকে ও এদের মধ্যেই সাহিত্যে পারদর্শী ব্যক্তির আবির্ভাব দেখা যায়।

'স্মৃতিশক্তি'র ব্যাপারে অবশ্য বংশানুক্রম বিশেষভাবে কাজ করে। তীক্ষ্ণ 'স্মৃতিশক্তি' সম্পন্ন মা-বাবার সন্তানরা তীক্ষ্ণ 'স্মৃতিশক্তি'র অধিকারী হয়ে থাকে। এরা যদি অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় তবে তো কথাই নেই। তবে হতাশায় ডুবে না পড়ে অনুশীলনের সাহায্যে এগিয়ে গেলে অনেকের মধ্যেই লুপ্ত 'স্মৃতিশক্তি'কে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীর সব তাই সময় 'স্মৃতিশক্তি'র অনুশীলনের উপরই জোর দেন এবং তাঁদের ধারণা এ থেকে অনেক শুভফল পাওয়া যায়।

শিশুর স্বপ্ন

মা যখন খোকনকে কোলে শুইয়ে দিয়ে বলেন :

'খোকন ঘুমলো,
পাড়া জুড়লো,
বর্গী এলো দেশে ;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে—
খাজনা দেবো কিসে।'

শিশু তখন নিশ্চিন্ত মনে সারা দিনের দুষ্টুমির ক্লান্তিতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। গানের সুরের ছড়া শিশুর চোখে ঘুমের আমেজ এনে দেয়। তাই সব দেশেই ঘুমপাড়ানি ছড়ার উদ্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এই ঘুমের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি। ঘুম সম্বন্ধে এক একজন বিজ্ঞানী এক এক রকম ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন : 'আদিম যুগে যখন আলোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না, তখন রাতের বেলায় কোথাও যাতায়াত বা কোনও কাজকর্ম করা একেবারে অসম্ভব ছিল বলে মনুষ্যসমাজ স্বভাবতই রাত্রিটিকে বিশ্রামের জন্য বেছে নিয়েছিল।' আবার কোনও কোনও বিজ্ঞানী বলেছেন : 'ঘুম হচ্ছে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের সাময়িক কার্যকারিতার ফল।' যে যাই বলুন—আমরা সাধারণভাবে বুঝি অনেক খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গেলেই আমাদের দু' চোখ আপনা থেকেই বুজে আসে এবং আমারা ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম থেকে ওঠার পর আবার নতুন প্রাণ-শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি।

ঘুমের ব্যাপারে শিশুরাই আবার সব চাইতে সুখী। দিনরাত অধিকাংশ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। একমাস বয়স থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা গড়ে ঘুমোয় ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। আবার এক বছর থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের গড়ে দশ ঘণ্টা ঘুমনোর নিয়ম। ঘুম ঠিক মতো না হলে ছোটদের শরীর খারাপ হয় এবং তাদের দেহের পুষ্টির অভাব দেখা দেয়।

ভালো ঘুম না হলে ছোটরা মায়ের কোল ঘেঁসে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ দিয়ে সাত সমুদ্দুর আর তের নদী পেরিয়ে চলেছে কোন্ অজানার পথে! আবার এ-ও দেখে কোথায় যেন সে চলেছে মাকে নিয়ে—সঙ্গে অনেক লোক। হঠাৎ একটা দত্যি কিংবা দানা এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। তাদের সবাই তো ভয়ে মলো। শুধু সে তার ছোট্ট তলোয়ারটি খাপ্ থেকে খুলে ঝপা ঝপ্ লাগালো কোপ্। দত্যিটা গেল মরে। আর সে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে বীর গর্বে মাকে নিয়ে চল্‌ল এগিয়ে।......

আচ্ছা, বল্‌তে পারা যায় কি কেন এমন হয়? স্বপ্ন আমরা দেখি কেন? এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। যেমন মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলেন: 'স্বপ্ন হলো—মানুষের মনের কোণে লুকোনো ইচ্ছে পূরণের একটা বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। তাই প্রত্যেকটি স্বপ্নের একটি অর্থ আছে। আর আছে তার মনস্তাত্ত্বিক মূল্য।' মনোবিজ্ঞানী রিভার্স (Rivers) এবং ওয়াট (Watt) স্বপ্নকে একটি ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান এবং অনিচ্ছা দূরীকরণের প্রকাশ বলে মনে করে থাকেন। ফ্রয়েড শিশুর স্বপ্নকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেছেন: 'ছোটদের দেখা স্বপ্নে সাধারণতঃ কোনও সমস্যার সমাধান থাকে না। ওতে থাকে শুধু ওদের শোনা অথবা পড়া কোনও না কোনও গল্পের নাটকীয় প্রকাশ।'

যেমন ন' বছরের একটি রোগা পট্‌কা ছেলে ঠাকুমার কাছে রাক্ষস খোক্কসের গল্প শুনে সেদিন রাতেই স্বপ্নে দেখল:

"আমি বীরে পরিণত হয়েছি। এমন সময় দেখতে পেলাম একটা রাক্ষস একটি সুন্দরী মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখেই মনে মনে মেয়েটিকে রক্ষার সঙ্কল্প নিলুম এবং রাক্ষসটার পেছনে তাড়া করে ছুটে গেলুম। হাতের তলোয়ারটি দিয়ে রাক্ষসটাকে একেবারে কুচি কুচি করে কেটে ফেল্লুম। মেয়েটি রক্ষা পেল ও আমাকে বলে উঠ্‌ল—'তুমি বীর'। ...আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলুম।"

ছোটদের স্বপ্ন বেশীর ভাগই ওদের খেলাধুলো, বড়দের কাছে শোনা গল্প এবং কথাবার্তার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এ পাড়ার ঘেন্না ও পাড়ার মেয়ে টেঁপির সঙ্গে তার পুতুল বিয়ের জোগাড় করছে। খাওয়া দাওয়া, বড়দের নেমন্তন্ন করা কিছুই বাদ যায়নি। এমন সময় ওদের মা এসে দু'জনকেই তুলে নিয়ে গেলেন—বিকেলে হাত-পা ধুয়ে, জামা-কাপড় পাল্‌টে একটু ভদ্দর গোছের হয়ে বেরুতে। মাঝ পথে ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটি শেষ না হতেই ওদের উঠতে হলো নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই। সেদিন কিংবা ক'দিন পর রাত্রির বেলা ওদের একজন স্বপ্নে দেখল :

"মস্ত বড় বাড়ি। চারদিকে দাস-দাসী, লোকজন ছুটোছুটি করছে। চারদিকে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে চলেছে। বর এসেছে বিয়ে করতে। সামনে কনে বসে। পুরুত ঠাকুর বিয়ের মন্ত্র পড়াচ্ছেন। এমন সময় দম্‌কা হাওয়া কোথা দিয়ে যেন বর আর কনেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার —দূর থেকে শুধু কান্নার শব্দ ভেসে আস্‌ছে।"

সেদিন রাতে মেয়েটি কেঁদে জেগে উঠল এবং দেখতে পেলো ওর বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে। দুপুরে খেলার ছলে যা পূর্ণ হয়নি তা পূর্ণতা পেলো না স্বপ্নেও।

ছোটরা অনেক সময় স্বপ্নের পাখায় ভর করে পাড়ি জমায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এই দেখল শুয়ে আছে নিজের

বিছানায় পরক্ষণেই নিজেকে আবিষ্কার করল অজানা-অচেনা জায়গায়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়েরা স্বপ্নে পৃথিবী পরিক্রমার ঘটনাই বেশি দেখে থাকে। অনেক সময় ওরা ভালো স্বপ্ন দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে। সব কিছু অনুধাবন করে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন—'স্বাস্থ্যবান শিশুরা সাধারণতঃ স্বপ্নে ওদের মনের ইচ্ছে-গুলোর পূর্ণতা দেখতে পায়। তাই তারা খুশিতে ভরে ওঠে।'

এবার বলি দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের 'স্বপ্নে দেখা' মজাদার কাহিনী। আমেরিকার একটি ছোট্ট দশ বছরের ছেলে একদিন স্বপ্নে দেখতে পেলো ঃ

> "আমি কতকগুলি কামানের গোলার অধীনে চলে গেছি। কামানের অনেকগুলি গোলা আমার সামনে হাততালি দিয়ে নাচছে আর গাইছে। ওরা সবাই যেন আমার মতো মানুষ। কিছুক্ষণ বাদেই আমি আমাকে আমার ঘরে আবিষ্কার করলাম। আমার বিছানার পাশে উনুনের ওপর কেটলিতে জল ফুটছে। গোলাগুলো আমাকে ধরে কেটলির মধ্যে ফেলে দিলে। ফুটন্ত জলে আমি ফুটতে লাগলাম। মাঝে একটি গোলা এসে দেখে গেল—-আমি সেদ্ধ হতে আর কত বাকি। এর পরে ওরা আমাকে কেটলি থেকে নাবিয়ে প্রধান গোলাকে খাদ্য হিসাবে উপহার দিল একটি পিরিচে করে।······এক অদ্ভুত স্বপ্ন। নিজেকে অন্যের খাদ্য হিসেবে উপহার দিতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লাম। অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

ইংল্যাণ্ডের আট বছরের মেয়ে স্বপ্নে দেখল ঃ— "সে নদীতে সাঁতরে কোথায় যেন চলেছে। হঠাৎ ওর সামনে একটি লোক ডুবে যাচ্ছে। লোকটিকে বাঁচাতে সে আরও জোরে সাঁতরে চল্‌ল। কিন্তু সামনেই ওর মাস্টারমশাইকে দেখ্‌তে পেলো। মাস্টার-মশাই তাকে হাত ইশারায় পড়ার ঘরে যেয়ে পড়তে বস্‌তে বল্লেন।······আজ যে সে মাস্টারমশাই-র দেওয়া একটি পড়াও

তৈরী করেনি। ওমা কি হবে? সেই শীতের রাতে—মাস্টার-মশাই আর পড়ার ভয়ে মেয়েটি ঘেমে নেয়ে জেগে উঠল।"

যুদ্ধের ভয়ে ভীত একটি ফ্রান্সের ছেলে স্বপ্ন দেখছে: "চারদিকে জার্মান বোমা পড়ছে। ভয়ে আমি একটা পাউরুটির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। একটা জার্মান সৈনিক রুটিটি খাওয়ার জন্য ওটা কাটতেই আমাকে তার মধ্যে আবিষ্কার করল। অমনি আমি পাখীর মতো ডানা মেলে উড়ে গেলাম দিগন্তে। ......তক্ষুণি আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল।"

আর একটি ইংরেজ মেয়ে তার স্বপ্নের কথা বল্‌তে গিয়ে জানাল: "গত রাত্রে আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। প্রথমে দেখলাম আমার বড় ভাই নাবিকের পোশাকে একটি যুদ্ধ জাহাজে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপরই মা'র কান্না আমার কানে ভেসে এলো।......আমার ভাই আস্তে আস্তে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। সামনে মা দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেলাম। তারপরই দেখতে পেলাম সবাই শব নিয়ে তৈরী হচ্ছে। আমার ভাইয়ের মৃত দেহটি জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত দেখতে পেলাম। পাশেই আবার আমার ভাইকে নাবিকের পোশাক পরে তারই শব যাত্রার আয়োজন দেখছেন—দেখতে পেলাম।......আমার মায়ের কান্না ভেসে এলো আবার। আমারও অসহ্য মনে হতে লাগল। আমিও ডুকরে কেঁদে উঠলাম।"

মনোবিজ্ঞানীরা বারো থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েদের স্বপ্নের বিবরণ অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে, এই সময়টিতে এরা সাধারণতঃ বীরত্ব, মৃত্যু এবং রহস্যাবৃত স্বপ্ন দেখে থাকে। দুর্বল এবং রুগ্ন ছেলেমেয়েরা ওদের বীরত্বের কাহিনী বেশির ভাগ স্বপ্নে দেখে। মনের আশা এবং আকাঙ্খাকে স্বপ্নের মধ্যে ফিরে পেয়ে এরা খুব আনন্দ পায়। এই ধরনের স্বপ্নকে মনের গুপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ বলে ধরা যেতে পারে। আমাদের এই দেশেরই একটি রুগ্ন ছেলের স্বপ্নের

কথা এখানে তুলে ধরছিঃ "আমার অনেক টাকা হয়েছে। অতগুলি টাকা আমার নিজের কাছে রাখা উচিত নয়। চোর ডাকাত আছে তো; তাই সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিলাম। একদিন দরকারে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলে আনতে গেলাম। পথে আসবার সময় দু'জন গুণ্ডা আমার পিছু নিলে। আমাকে তাড়া করলে। ভয় পেয়ে পালিয়ে না গিয়ে গুণ্ডা দু'টিকে লাগালাম দু'ঘুষি। ঘুষিতে গুণ্ডা দুটোকে কাবু করে ছুটে পালিয়ে এলাম বাড়িতে। বাড়িতে এসে টাকাগুলি বালিশের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। ...... সকালে ঘুম ভেঙ্গে টাকাগুলির কথা মনে পড়তেই বালিশের তলায় হাতড়াতে লাগলাম। তক্ষুনি মনে পড়ল, এটি শুধুই স্বপ্ন, সত্যি নয় তো।"

আমাদের দেশেরই এক পাহাড়ী ছেলে স্বপ্নে দেখলঃ "যেন মস্ত বড় একটা বাঘ ওদের বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে রাত্রির অন্ধকারে। ওর মা-বাবাকে বাঘটি খেয়ে ফেলল। ওকেও খেতে শুরু করেছে। কই ওর তো একটুও লাগছে না বরং মজা করে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঘের আহার দেখছে সে।"......

রাত্রিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা ছাড়াও অনেকে বসে জেগে থেকে এক ধরনের 'দিবা স্বপ্নে' অভ্যস্ত হন। যেমন কোনও একটা কিছু করতে হবে তার পরিকল্পনা এবং পূর্ণতার একটা পরিষ্কার ছবি এই দিবাস্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক— ছোট ছেলে শ্যামলের ইস্কুলের সঙ্গে অন্য একটি ইস্কুলের ক্রিকেট ম্যাচ আছে আগামী দিনে। ইস্কুলে তখন অঙ্কের ঘণ্টায় শ্যামল মোটেই মন দিতে পারছে না দুরূহ আঁক কষার মধ্যে। তার মন তখন উড়ে গেছে কোন্ সুদূরে......। 'খেলার মাঠে তখন দু'দলে ক্রিকেট খেলা চলেছে। শ্যামলের দল ব্যাট করছে। বিপক্ষ দলের কাছে তারা মোটেই সুবিধে করতে পারছে না। সকলেই উইকেট হারাচ্ছে।

শেষ দিকে শ্যামলের পালা এল। সে মাঠে নেবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সমানে রান তুলতে লেগেছে—বোলাররা তার কাছে একেবারে নাজেহাল। ইস্কুলের মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'শ্যামলদা কী জয়' চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। এমন সময় মাস্টারমশায়ের চোখ পড়ল শ্যামলের দিকে, সে মোটেই তাঁর কথা শুনছে না। তখন রেগে গিয়ে তিনি শ্যামলকে বোর্ডে একটা আঁক কষতে দিলেন। চমকে উঠে শ্যামলের স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গেল। তখন তার মনের অবস্থা খুব শোচনীয়, পৃথিবীর সমস্ত জড়তা যেন এসে তার সারা শরীরে তখন ভর করছে।

আবার হয়তো ভালো বলিয়ে-কইয়ে ছেলে কুশল রায় বাসে চলেছে কোথাও। মন তার তখন ভরপুর স্কুলের আগামী বিতর্ক-অধিবেশনের স্বপ্নে। মন তখন তার কোথায় চলে গেছে। বায়স্কোপের ছবির মতো সাম্‌নে শুধু ভাস্‌ছে : 'চারদিক লোকে লোকারণ্য। অধিবেশনের শুরুতে একজন গান গেয়ে শোনালে। তারপর বিপক্ষের দলের সেই ভোঁদা মার্কা ছেলেটি বিষয়টির পক্ষে হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বল্‌লে। তারপর এল ওর পালা তার নিজের দলের পক্ষ থেকে বলার। সে উঠে এমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে তার কথাগুলি বলে গেল যে অন্যদলের আর কিছু বলার থাক্‌ল না। মাস্টার মশাইরা খুব খুশি হলেন। সকলেই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তার দলের অনেকেই মালা নিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে........।' এমন সময় তার চমক ভাঙ্গল বাসের পাঞ্জাবী-কণ্ডাক্‌টারের কর্কশ গলায়—'বাবু বালীগঞ্জ আ-গিয়া অব উতর যাইয়ে।' ও হয়তো যাবে কালীঘাট, উঠেছে শ্যামবাজার কিংবা টালা থেকে। চলে এল একেবারে শেষ সীমানায়—বালীগঞ্জে।

এই যে 'দিবা স্বপ্ন' এ থেকে অনেক সময় কিশোর মনের ধারাকে খুঁজে পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় ছোটদের ভাবীজীবনের আদর্শের সন্ধান। আবার এই দিবা স্বপ্ন সম্বন্ধে কিন্তু মনোবিজ্ঞানী স্টান্‌লে হল

(*Stanlay Hall*) এবং তাঁর ছাত্র বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন : 'বেশীর ভাগ দিবা স্বপ্নই ছোটদের বাস্তব থেকে বিছিন্ন করে শুধু কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। এটা তাই অনেক সময় ভালো ফল না দেখিয়ে মারাত্মক ফল রূপে দেখা দিতে পারে।

ছোটরা অনেক সময় স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এবং অনেক সময় ওদের ভাষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায়—স্বপ্নটিকে গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। যে সমস্ত শিশুদের বিকাশ শৈশব থেকে যথাযথ ভাবে হয় না এবং যারা বয়স অনুপাতে জীবনকে জানবার সুযোগ পায় না—তারাই স্বপ্নে সাধারণতঃ তাদের জীবনের পূর্ণতাকে দেখ্তে পায়। অবশ্য এই ব্যাপারে বড়দের খেয়াল রাখতে হয় যেন ছোটদের কল্পনা আকাশস্পর্শী হয়ে বাস্তবকে ছাড়িয়ে না যেতে পারে এবং তাদের কল্পনা যেন সুখ ও দুঃখে মাখা এই পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে চল্তে পারে। এই জন্যই শিশুদের স্বপ্ন সংযমেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মনোবিজ্ঞানী—আর্নল্ড ফরস্টার (Arnold Forster) এই সংযম শিক্ষার এক বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : 'স্বপ্নকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। প্রথটি হলো—ভালো অর্থাৎ মজার অথবা আনন্দের। অন্যটি হলো—খারাপ অর্থাৎ দুঃখের বা ভয়ের। আনন্দের স্বপ্ন মোটেই ক্ষতি করে না কারো। কিন্তু দুঃখের বা ভয়ের স্বপ্ন প্রত্যেকের পক্ষেই, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে ক্ষতি কারক। তাই ভয়ের স্বপ্ন থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হয়। শিশু যাতে ভালো স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয় তার জন্য সে যখন গল্প বুঝতে শেখে তখন সুন্দর সুন্দর মজার গল্প দিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখতে হয়। এই গল্পের অভাবনীয় শক্তি দেখা যায়.—তারা মজার মজার শক্তি ও সাহসের স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়। কারণ স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক গবেষণার ফলে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে—'স্বপ্ন হলো ব্যক্তিগত চরিত্রের কর্মধারার প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও কার্যক্রম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে অথবা যে প্রকাশের ইচ্ছা অবচেতন মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তা-ই স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর ফলে ব্যক্তিগত চরিত্র, চিন্তা ও কর্মধারা স্বপ্নের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে।'

শিশু-অঙ্গের বিকৃতি

শিশুর অঙ্গের বিকৃতি সাধারণতঃ জন্ম সময় থেকেই দেখা যায় না। বিভিন্ন কু-অভ্যাসের ফলে ওদের দেহে বিকৃতি দেখা দেয় আর দেখা দেয় খুব শৈশবে মায়ের অবহেলার ফলে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় মার গর্ভ থেকে তখন তার দেহটি থাকে নরম তুল্‌তুলে। অনেক সময় গর্ভকালে মায়ের পেটে কোনও আকস্মিক আঘাতের ফলে শিশু অঙ্গের বিকৃতি নিয়েই জন্ম নেয়। যেমন পা থাকে সরু অথবা বিকৃত, অথবা মাথার দিকের গড়ন হয় অস্বাভাবিক রকমের, আবার স্বাভাবিক জন্ম হয়েও মায়ের অবহেলায় তুলতুলে নরম মাংসের ডেলা সেই শিশুর অঙ্গে বিকৃতি ঘটে থাকে।

আমাদের দেশে একটি চল্‌তি প্রবাদ আছে—'তেলে জলে মানুষ।' কথাটি কিন্তু খুবই সত্যি। ছোট্ট শিশুকে মায়েরা তাই স্নানের আগে সরষের অথবা অলিভ তেল মালিশ করে খানিক্ষণ রোদ্দুরে ফেলে রাখেন। অবশ্য একটি কথা সমস্ত মাকেই মনে রাখতে হবে যে রোদ্দুরে যখন শিশুকে শুইয়ে দেবেন তখন যেন শিশুর মাথাটি রৌদ্দুরের তাত থেকে রক্ষা পায়।

আজকাল মায়েরা অতটা ঝক্কি পোয়াতে নারাজ। তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা দেখতে হয় প্যাকাটির মতো আর অসুখে ভুগে সারা জীবন জন্মাবার পর থেকেই। এই কারণেই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ভাবে পুষ্ট হয় না, তার ফলেই অনেক সময় অঙ্গ বিকৃতি দেখা দেয়। আর যেখানে-সেখানে অযত্নে পড়ে থাকার

জন্মে কার পায়ের বিকৃতি, কারো নাক চ্যাপটা, মাথার কোনও অংশ ফুলে একেবারে সুপুরি। আবার হয়তো কারো একটা কান বড় হলো আর একটা কান থেকে গেল ছোট আকারের।

ছেলে বা মেয়ে হয় অনেকেরই। বছর বছর একটি করে। কিন্তু তাদের মানুষ করার ঝক্কি বা কষ্ট আমরা কেউ নিতে চাই না। তাই ভালো ফল পাবে কেমন করে ? যত কষ্ট এবং সতর্কতার সঙ্গে শিশুকে মানুষ করা যাবে ততই তার মধ্যে একটি সুন্দর পুরুষ অথবা নারীর আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যাবে। তাই শিশুতীর্থের পথ হলো ধৈর্য ও সহ্যের পথ !

পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে প্রতি দশজন প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ভেতরে প্রায় আট জনই পায়ের কোনো না কোনো বিকৃতিতে ভুগে থাকে। এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি শিশু-কালে উপযুক্ত চিকিৎসা করানো হতো তা হলে এ ধরনের ক্লেশকর অবস্থা খুব সহজেই এড়ানো যেত। চিকিৎসকরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে—পায়ের অস্বাভাবিকতা অধিকাংশই ছেলেবেলার সৃষ্টি। একই কারণ এর পেছনে কাজ করছে। ছোটবেলায় তাদের পায়ের হাড় থাকে খুব নরম ও নমনীয়। তখন যে-কোনও মাপের জুতো বা মোজা পরিয়ে কাজ সমাধা করা হয়। আর চঞ্চল শিশুরা পায়ে ব্যথা পাচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য দেওয়ার ফুরসৎ পায় না। কিংবা ব্যথাকে একেবারে উপেক্ষা করে চলে। এই কারণেই মা বাবার অব-হেলার ফলে তাঁদের অগোচরে শিশুর কচি কচি পা গুলি ধীরে ধীরে খোঁড়া ও অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

মানুষের পা যোল থেকে কুড়ির মধ্যে স্থায়ী আকৃতিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তখন চিকিৎসা করে আর কোনও ফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া জন্ম থেকে পায়ের বিকৃতিও অনেক সময় মা-বাবার অবহেলার ফলে স্থায়ী বিকৃতিতে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিকৃতিও সময়ে চিকিৎসার দ্বারা দূর করা যেতো হয়তো খুব সহজেই।

অতএব শিশুদের খোঁড়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে মা-বাবাকে শিশুদের এই দিকটায় বিশেষ করে যত্ন নিতে হবে।

ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয় সমূহের স্বাস্থ্য তত্বাবধায়কেরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রীতিমত গবেষণা ও চিন্তা করতে শুরু করেছেন। এই সেদিনকার কথা ইয়র্কশায়ারের শিল্পাঞ্চল থেকে ৯০৮ জন শিশুর পা পরীক্ষা করে এক বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫২৩ জন ছেলে এবং অবশিষ্ট ৪৮৫ জনই হলো মেয়ে। প্রথমেই লক্ষ্য করা গেল যে, শতকরা তিরাশি জন মেয়ে এবং শতকরা একষট্টি জন ছেলের পায়ে ছোট মাপের জুতা অতি কষ্টে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের দিনে যেমন পা ছোট রাখার জন্যে চীন দেশের মেয়েদের করা হতো। এর ফলে তাদের পায়ে দেখা দিতো বিকৃতি। খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা গেল মাত্র ৩০% জন ছেলে বা মেয়ের পা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ৫৪% জন শিশুর পায়ের আঙ্গুল নরম ও বৃদ্ধিশীল। ২৩% জনের পায়ের আঙ্গুল একেবারে শক্ত ও কঠিন হয়ে গেছে। ৫% জনের পায়ের পাতা হলো সমতল।

এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগতে পারে—বড় হয়ে যাতে শিশুর পায়ের কোনও রকম বিকৃতি না ঘটে তার জন্যে কি রকম ব্যবস্থা করা উচিত ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে প্রথমতঃ ছেলে-মেয়েদের জুতো কিনতে গেলে দোকানদারের কথা মতো বিশেষ নম্বর দেওয়া জুতো কেনা উচিত নয়। কারণ নম্বর বা সাইজের কোনও বিশেষ নির্দিষ্ট মান নেই। দ্বিতীয়তঃ জুতোগুলি পরিয়ে বাচ্চাদের বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে দেখতে হবে যে পায়ের কোথাও লাগছে কিনা। তৃতীয়তঃ চামড়ার জুতোই ছোটদের ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। তার কারণ হলো চামড়া সচ্ছিদ্র ও ঘাম শোষক। এর ভেতরে বায়ু চলাচল করে থাকে। চতুর্থতঃ জুতো কখনও ভারী বা শক্ত হওয়া উচিত নয় পরন্ত হালকা ও একটু বড় আকারের জুতো শিশুদের পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক।

অনেক সময় মুদ্রাদোষে অথবা বদ্ অভ্যাসের ফলে ও শিশুর অঙ্গের

বিকৃতি ঘটে থাকে। অনেকে স্টাইল করে পিঠটা সাম্নের দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে পথ চল্‌তে চেষ্টা করে। ফলে সোজা হয়ে আর কোনও কালে চল্‌তে পারে না। কোমর থেকে ওপরের অঙ্গটি ধনুকের মতো বেঁকে যায় ও পিঠের বিকৃতি ঘটায়। আবার অনেকে ঘাড় কাৎ করে পথ চল্‌তে ভালোবাসে। এর ফলে একটি কাঁধ অন্যটির চাইতে বড় দেখায়। ফলে কাঁধের বিকৃতি ঘটে। পড়ার সময় অনেকে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে লেখাপড়া করে। ফলে পরিণত বয়সে কাঁধটি কুঁজো হয়ে যায়।

ঘুমনোর সময় নিঃশ্বাস মুখ দিয়ে নিলেও অনেক সময় মুখের বিকৃতি ঘটে থাকে। ছোটবেলায় ব্যায়ামের সময় অসাবধানতার ফলে মুখের বিকৃতি দেখা দেয়। আবার সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম চর্চা না করার ফলে বিশেষ অঙ্গের পুষ্টি হয় এবং অন্য অঙ্গগুলি অপুষ্ট থেকে যায়। ফলে শরীরের বিকৃতি দেখা দেয়।

ছোটবেলা মা-বাবার বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয় শিশুরা যাতে বিকৃত অঙ্গ মানুষকে কখনও নকল করতে চেষ্টা না করে। কুঁজো মানুষের অথবা খোঁড়া লোকের অভিনয় করতে ছোটরা খুব ভালোবাসে। ফলে শিশুর অঙ্গ-বিকৃতি দেখা দেয়। শিশু যখন বড় হয়ে উঠছে তখন অভিভাবকদের উচিত, ওদের শোয়া-বসা এবং চলা-ফেরা সব দিকেই লক্ষ্য রাখা। অস্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে ফিরতে দেখলেই মা-বাবারা খোঁজ নেবেন—'কেন এমন হচ্ছে?' প্রথম থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখলে শিশুর অঙ্গের বিকৃতি ঘট্‌তে পারে না। আবার ঘটলেও তা দূর করা যায় খুব সহজেই।

—–—

শিশুর কু-অভ্যাসের মূলে

সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি দেখতে। দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যেই হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে চেষ্টা করছেন তখনই ও দূরে থেকে উত্তর করল—'লাথি খাবি, লাথি খাবি'। প্রথম প্রথম হয়তো ভাব্‌লেন, অন্য কারো উদ্দেশ্যে সে তার লাথি উপহার দিচ্ছে। আবার হয়তো হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলেন—অমনি বলে উঠ্‌ল—'এই উল্লুক-লাথি খাবি।' এরপর কথা থেকে এল কাজ—সত্যিই লাথি ছুড়লো আপনার উদ্দেশ্যে। এই কু-অভ্যাসটি কি করে হলো সে সম্বন্ধে হয়তো ভাব্‌তে বসে গেলেন। শিশু জন্ম থেকেই তো আর এই কু-অভ্যাস নিয়ে জন্মায় না। জন্মায় তারা দেবশিশু হয়েই। তার পারিপর্শ্বিক হলো সেই কু-অভ্যাসের মূলে।

সব শিশুই দুষ্টুমি করতে ভালোবাসে। দুষ্টুমি করা এমন কিছু অপরাধেরও নয়। শিশুর দুষ্টুমিকে সাধারণ ভাবে খেলার পর্যায়ে ফেল্‌তে পারলে তার থেকেই তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও দুনিয়াকে দেখতে শেখে ও তার চলার পথ করে নেয়। এখন আমাদের জানতে হবে তার কোন দুষ্টুমিগুলি স্বাভাবিক দুষ্টুমি আর কোন্‌গুলি হলো তার কু-অভ্যাসের মূলে। এই আলোচনাটি পূর্ণভাবে করতে হলে আমাদের জান্‌তে হবে শিশু-মনের গঠন সম্বন্ধে।

শিশু যখন জন্মায় তখন কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়—যাকে বলা হয়ে থাকে সহজাত প্রবৃত্তি। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অথবা সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জন্মের সময় শিশু সামাজিক জীব হয়ে জন্মায় না। সে তখন অন্য দূরে থাকুক—মাকেই খুব ভালো করে চেনে না বা জানে না। তখন তার ভালো লাগা এবং না লাগা একটা অনুভূতি মাত্র। কিন্তু কী যে তার ভালো লাগে আর কী সে লাগে না তখন তা সে জানে না। তাই খাদ্যাখাদ্যের তারতম্য না বুঝে হাতের কাছে যা পায় তাই মুখে দেয়। এমন কি হাতের কাছে পোকা, পিঁপড়ে যা পায় তাতেই হাত দিতে চেষ্টা করে। এরপর সে চিন্‌তে শেখে তার মাকে। তার কারণ হলো খিদে বা তৃষ্ণায় তার মা-ই তাকে সাহায্য করেন, আহার জোগান ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে সে ঠেকে শেখে। পিঁপড়ে ধরতে গিয়ে কুটুস কামড় খেয়ে সে চিৎকার করে। পরে অন্য দিন ঐ পিঁপড়ে দেখলেই ভয় পায়। এইভাবে ক্রমশঃ ভালো লাগা ও না লাগার বস্তুগুলির পার্থক্য বুঝতে শেখে। সাধারণতঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্টুমিগুলি কমতে আরম্ভ করে। কিন্তু অনেক সময় ওগুলি না কমে উল্টে বিকৃত ও প্রচণ্ডতর হতে শুরু করে। কখনও কখনও দুষ্টুমি চরমে ওঠে ও মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিশদভাবে ঐ সমস্ত শিশুর জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেই শিশু তার অভিজ্ঞতাকে মোটেই কাজে লাগাতে পারেনি। তাই তার সেই দুষ্টুমিগুলি কু-অভ্যাস হয়ে জীবনে গেঁথে আছে।

এই কু-অভ্যাসের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে—যে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে শিশু জন্মেছে তার বিকাশ ঠিক মতো হয়নি। সেগুলি রূপ পাল্‌টে এরকম বিকট রূপ ধরেছে। শৈশবে যা দুষ্টুমি বলে মনে হয়েছিল—তা মা-বাবার অসতর্কতার ফলে শিশুর মধ্যে শেকড় গেড়ে বসেছে। সেটি যে কবে দূর হবে তা বলা খুবই মুস্কিল। আর ঐ বদ অভ্যাসগুলি দূর না হলে তো শিশুটিকে সুন্দর বলে মনে হবে না। শুধু আবার শাসকের মনোভাব নিয়ে শিশুকে মানুষ করা যাবে না। প্রতিটি মুহূর্তে তার বিষয়ে ভাববার অবকাশ রাখা দরকার।

মা-বাবার দায়িত্ব শিশুর প্রতি সব চাইতে বেশি। কিন্তু তাঁরাই সেদিকে কোন দৃষ্টি দেন না। যেমন স্নেহে তাঁরা কখনও কখনও অতিরিক্ত আদর দেন, তেমনি রেগে গেলে তাঁরা কখন যে কী বলেন আর যে কী করে বসেন তার কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না। একটা তুচ্ছ মূহূর্তের অসতর্কতার ফলে একটি শিশুর সারা জীবনই বিষময় হয়ে ওঠে। অসতর্ক মুহূর্তের জন্যেই তাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বিকৃতভাবে খিড়কির দরজা দিয়ে পথ করে নেয়। তাই তারা পরবর্তীকালে অপরাধ করে ও সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় এবং কড়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। কু-অভ্যাসগুলিই তাকে টেনে নিয়ে চলে গুরুতর অপরাধের দিকে।

শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহজ ও স্বাভাবিক রূপ পালটানোর মধ্য দিয়েই সেগুলির এমন সার্থক উৎকর্ষ দেখা যায় যা পরে আর সেগুলোকে চেনাই যায় না। এই উৎকর্ষতার পথে বাধা পেলেই ঐ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় ও শিশুকে অপরাধী হতে সাহায্য করে থাকে। শৈশবে 'লাথি মারবো' কথাটি শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তো আর লাথি মারতে শেখে না। ঐ অভ্যাসটি সম্পূর্ণ পায় মা-বাবার আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই। উত্তর জীবনে ঐ লাথি মারাই—লাঠি মারতে শেখায় এবং অকারণে অন্যকে উৎপীড়ন করবার প্রেরণা পায় মনে মনে। এরপর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক চাপ ও নিজের সম্পর্কে হীনতা বোধই তাকে অপরাধের পথে টেনে নিয়ে যায়। এই অপরাধ আবার বেড়ে ওঠে আরও ভীষণ ভাবে—তার মনের অহং বোধ, মনের ন্যায়-অন্যায় বোধ বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিস্বল্পতা এবং বিশেষ ধরনের এক রকম রোগের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হলো সে যে অপরাধ করছে তা কি তার শৈশবের কু-অভ্যাসের ফলে না তার বংশানুক্রম, পারিপার্শ্বিকেরও কিছুটা অংশ আছে এতে?

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এটাই স্থির নিশ্চয় হয়েছেন যে শৈশবে অর্থাৎ শিশুর পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত

তার দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে সে উত্তরকালে কখনই দেহ ও মনের দিক থেকে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। বরং সু-স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু মনের গঠনের ফলে সে পায় সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের গঠন। সু-নাগরিক হয়ে নিজের পরিবারের ও দশের সুখ্যাতি নিয়ে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় সফলতার দিকে।

শিশুর জীবনে মা-বাবা যে কতখানি তা অন্য একটি ভিন্ন প্রবন্ধতে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও এখানে তার কিছুটা উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। মা-বাবার কাছ থেকে সে পায় তার জীবন গড়ার দু'টি অপরিহার্য উপাদান। দু'রকমের দু'টি ব্যক্তিত্ব তাকে ভরিয়ে তোলে। মা তার কাছে একেবারে আপন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমস্ত অক্ষমতার গৌরব, অপরাধের ক্ষমা ও দুঃখের অবসান তার মা'র কাছে। বাবার ভালোবাসা কিন্তু অন্য ধরনের। সে তাই বাবাকে লজ্জা পায়, তার দুঃখের সেখানে অবসান নেই, আছে শুধু অপরাধের কঠোর বিচার। বাবা যেন শিশু থেকে বেশ একটু দূরে।

গাছের সঙ্গে মাটির অতি নিকট সম্বন্ধ। মাটি গাছকে রস জোগায় আর মাটিকে আঁকড়ে ধরে গাছ বেড়ে ওঠে। শিশুর কাছে মা-ও তেমনি। তাই 'মা' যদি একেবারেই মাটির মা হন তবে তাতে বিপদ আসে। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ছেলেমেয়েরা একেবারে গোল্লায় যায়। গাছের কাছে আকাশ শুধু দূর নীলিমার নির্দেশ। আকাশের সূর্যের তাপ, বজ্র ও বৃষ্টি গাছের বড় হওয়ার ব্যাপারে যেমন সাহায্য করে, দূর থেকে লালনপালন ও রক্ষা করে। তেমনি বাবা শিশুকে দূর থেকে স্নেহ দিয়ে, বৃহৎ ব্যক্তিত্বের পরশ দিয়ে তাকে রক্ষা ও পালন করে থাকেন। তাই সে বাবার কাছ থেকে যদি শাসনই পায় আর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং ভয় সেখানে তার সঙ্গে পিতার বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সাধারণত শিশুকে স্কুলে পাঠানো হয়—তাকে কয়েকটা পাস করিয়ে ভালো চাকরির বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো প্রত্যেক

বাবার প্রধান আদর্শ। আর মা চান ছেলে স্কুলে যাক—তাহলে তাঁর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটির ব্যাঘাত হবে না। সেই জন্যই তো আমাদের দেশের স্কুলগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক একটি কয়েদখানা। শাসন সেখানে কড়া, নীতি-শিক্ষার বাল ই নেই কোথাও। বইগুলি অতি-বিবরণ আর নীতি-কথায় ভরা। কল্পনা বা আকর্ষণের বালাই নেই সেগুলির মধ্যে। অল্প বেতনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আছেন তাঁদের জীবনের বিরক্তি ও সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঝাড়তে। তাঁদেরও দোষ দেওয়া যায় না। কথায় বলে—'যাঁরা জীবনে অন্য কিছু করতে পারেন না তাঁরাই শিক্ষকতা গ্রহণ করে থাকেন।' নিরস বইয়ের বিরস পড়া শিশুর মনকে বিদ্রোহ করে তোলে। তখন তারা পথ খোঁজে এই নিরসতার আসান ঘটানোর। কু-সঙ্গে মিশে, কু-অভ্যাসের দাস হয়ে মাস্টারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, সাথাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে স্কুল জীবনকে বিরস করে তোলে।

পড়াশুনো তো একদম করে না। না স্কুলে না বাড়িতে। তাদের দেখবারও কেউ নেই। তারা যে সকলেই ধর্মের ষাঁড়। ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া। তাই পথে-ঘাটে চরে বেড়ায় আর গুণ্ডামী করে। এর এটা ওর ওটা চুরি করে বেড়ায়। পরীক্ষার সময় পায় শূন্যের কাছাকাছি। মাস্টারদের ভয় দেখায়। মারধোর করে নম্বর আদায় করতে চেষ্টা করে। এই দুঃখের যদি আমরা অবসান ঘটাতে চাই তবে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের নজর দিতেই হবে। জাতীয় সরকারকে দেখতে হবেই শি-শুশিক্ষার এই বিশেষ দিকটাকে।

বিপথগামী শিশুদের ফিরিয়ে আনা বড় সহজ কথা নয়। তার চাইতে সে যাতে বিপথগামী না হতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া বরং সহজ। তাই মা-বাবাকে অনুরোধ, তাঁরা যেন সমস্ত সময়ই তাঁদের অফুরন্ত কাজের মধ্যেও তাঁদের অতি আদরের সন্তানটির দিকে দৃষ্টি রাখেন। দৃষ্টি দেন যাতে সে পরিমিত আদর যত্ন, শিক্ষা ও শাসনের মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে

পারে। মা-বাবা দৃঢ় থাক্‌লে স্কুলের শিক্ষা বা অব্যবস্থা তাকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। একটা কথা সমস্ত সময় মা-বাবাকে মনে রাখতে হবে, যত দুষ্টুই তাঁদের শিশুটি হোক্ না কেন ভালোবাসার কাছে সে কাবু। তাই ভালোবাসা দিয়েই তাকে জয় করতে হবে।

প্রত্যেক ছেলেই খুব খেল্‌তে ভালোবাসে। খেলাধুলো তার দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই প্রয়োজন। ঐ সময় পড়ার চাইতে খেলার দিকে বেশি নজর দিতে হয়। মাঠে ও ঘরে নানান্ রকম খেলা আছে যা দিলে সে বিপথগামী হওয়ার কোনও সুযোগই পায় না। এমন কি বিপথগামী শিশুকে বেশিক্ষণ খেলার মধ্যে নিযুক্ত রাখলে তার অপরাধ স্পৃহা কমে আসে ও সে ভালো হয়ে উঠে দশজনের একজন হয়ে দাঁড়ায়। শুধু শিশু কেন, যুবকদের বেলাতেও এই কথা খাটে। যৌবনের শুরুতে যদি খেলাধুলো ও কাজের মধ্য দিয়ে কোনও মানুষকে গড়া যায় তবে তার দ্বারা কোন অপরাধমূলক কাজ করাই সম্ভব নয়। যৌবন-শক্তি হলো ভূতের শক্তির মতো। তাকে সমস্ত সময় কোনও না কোনও কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে হয়। তা হলেই কু-শক্তি. সু-শক্তিতে পরিণত হয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ করে। প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই তার জন্য তার শক্তিকে গড়ে তোলেন খেলাধুলোর মাধ্যমে। আমাদের দেশেও সে চেষ্টা হলেই—সুফল দেখা যাবে। অপরাধপ্রবণতা দূর হয়ে জাতীয় জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়ে গড়ে উঠ্‌বে।

আধুনিক শিশু-শিক্ষার মূলই হলো খেলার ছলে পড়ানোর নতুন নীতিটি। কিংবা আবার যে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে ছোটদের মধ্যে—তা চরিতার্থ হয় কোনও কিছু 'ভাঙ্গা আর গড়া' খেলার মধ্যে দিয়ে। হাতের কাছে খেল্‌না পেলে শিশু তা ভাঙ্গে আবার তা গড়তে চেষ্টা করে। ঐ সমস্ত অংশগুলি সম্বন্ধে তার কৌতূহল জাগে ও তখন সাহায্য করলে তার মধ্যে নতুন সৃষ্টি করার অদম্য উৎসাহ দেখা দেয়।

ছেঁড়া টুক্‌রোগুলি সাজিয়ে পুরো ছবি বানাতে চেষ্টা করে। শব্দ তৈরী, ছবির গল্প বলা ও অঙ্কের খেলার মধ্য দিয়ে পড়ার দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পরে ওরাই উত্তর জীবনে হয়ে ওঠে কেউ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক আর কেউ বা দেশনেতা।

অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্য অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও কয়েকটি সংশোধনালয় আছে। সেগুলি কিন্তু শিশুকে অপরাধমুক্ত করবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। সেগুলিকে জেলখানা বা খোঁয়াড় বলা যেতে পারে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও কবে মনোবিজ্ঞানীরা বিদেশের মনোবিজ্ঞানীদের মতো দৃষ্টি ও সহনশীলতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন? কবে দেশের সরকারকে এ ব্যাপারে আগ্রহশীল দেখতে পাব? সেদিন আরও কত দূরে কে জানে?

মা-বাবা ও শিশু

মা-বাবাই হলেন শিশুর চরিত্রের প্রধান আদর্শস্থল। কোনও শিশুই 'সমস্যা-শিশু' হিসেবে দেখা দেয় না যদি তারা মা-বাবার কাছে প্রকৃত শিক্ষা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। আমাদের মা-বাবারা বেশির ভাগ সময়েই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সংসারে সমস্যা অগণিত। তাই শিশু হয় অবহেলিত। যখন খেয়াল হলো তার কথা তখন যে 'সমস্যা শিশু'তে পরিণত হয়েছে। এই 'সমস্যা শিশু' কিন্তু বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। যেমন অকাল পক্ব শিশু, অতিরিক্ত চঞ্চল শিশু, গভীর আলস্যযুক্ত শিশু, স্বপ্ন বিলাসী শিশু, খিট্‌খিটে মেজাজের শিশু, অকারণ ভীতু শিশু, কলহ ভালোবাসে এমন শিশু, মিথ্যাভাষী শিশু, নিষ্ঠুর অথচ ঈর্ষাপরায়ণ শিশু, নিজেকে জাহির করার অদম্য প্রয়াসযুক্ত শিশু, পরস্ব অপহরণকারী শিশু ও নিশিচারণ শিশু প্রভৃতি।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা বিচিত্র শিশুসমস্যার উৎস সন্ধানে অভিযান করে এই কথাটিই মানব সমাজকে জানিয়েছেন যে তার প্রতি মা-বাবার অদ্ভুত আচরণ ও মনোভাবই তাকে 'সমস্যা শিশু'তে পরিণত করে। কোনও শিশুই 'সমস্যা' হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তার পরিবেশই তাকে সমস্যামূলক করে তোলে। মা-বাবাই হলেন শিশুর প্রথম পরিবেশ। আর তাঁরাই তাকে জটিলতর করে তুলতে সাহায্য করেন সব চাইতে বেশি। অবশ্য পরে যখন তাঁরা সেটা অনুভব করতে পারেন তখন এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কামনা করেন। এখানে

'সমস্যা শিশু'কে কীভাবে সংশোধন করা সম্ভব সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশু-পালনে স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতা নেই। পুরুষেরা মনে করেন যে শিশু-পালনে মেয়েদের দায়িত্বই বেশি। তাই এদিকে তাঁরা মোটেও দৃষ্টি দেন না। কিন্তু মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করে উঠে আর ছেলে-মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না। আবার ভাবেন যে-সময়টা তারা ছেলে-মেয়েদের জন্য নষ্ট করবেন সে সময়টা তাঁরা আমোদ-প্রমোদে কাটাতে পারেন। তাই ছোটরা হয় অবহেলিত। আবার অনেক সময় মা-বাবা শিশুকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে থাকেন। সে যদি বাবার অতিরিক্ত আদরের হয় তা হলে মায়ের মনে ঈর্ষা জাগে। আবার স্বামী যদি দেখেন স্ত্রী সন্তানের চিন্তায় সর্বদা কাতর তবে সন্তানের প্রতি তাঁর আক্রোশ জাগে।

অনেক সময় যে মা শৈশবে তাঁর মা-বাবার কাছে উপযুক্ত আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি তাঁর সন্তানকে সেরকম ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। অতিরিক্ত তিরস্কার ও পীড়ন জোটে ঐ সমস্ত মায়ের সন্তানদের ভাগ্যে। অবশ্য এই ধরনের আচরণ তাঁরা খুব বুঝে করেন না। এগুলি তাঁর সমস্তই অবচেতন মনের প্রকাশ। অনেক সময় পরনির্ভরশীল অথবা অলস ধরনের মা-বাবারা নিজেদের সমস্ত কাজই তাঁদের সন্তানদের দিয়ে করিয়ে নিতে চান, এর ফলে ক্ষমতা বহির্ভূত অনেক কাজ শিশুর ভাগ্যে জোটে। ঐ কাজগুলি করতে না পারার জন্য তিরস্কার ও প্রহারই তাদের সঙ্গী হয়।

আর এক ধরনের মা-বাবা আছেন যাঁরা অতিরিক্ত আদর দিয়ে নিজের সন্তানদের 'আলালের ঘরের দুলাল' করে তোলেন। এইসব সন্তানেরা যা আবদার ধরে তাই পায়। ফলে এরা 'সমস্যা শিশু' হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মা-বাবার যদি একমাত্র সন্তান হয় তবে তার আদুরে হওয়ার সম্ভাবনাই সব চাইতে বেশি। চাওয়া-পাওয়ার একটা

সীমা রেখার মধ্যে যতগুলি চাওয়াকে পাওয়ার মধ্যে ধরা যায় ততই মঙ্গল। তা না হলে দুঃখ আসে। বড় লোকের আদালের ঘরের দুলালের আবদারের ফলে গরীব লোকটিকে হয়তো সারা দিন না খেয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। এ ধরনের আবদার কার্যকরী হওয়ার ফলে ঐ রাজকুমার নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে দাঁড়াল। শিশুদের যতগুলি আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে চরিতার্থ করা সম্ভব ততটাই করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে যাতে সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা ও নীতিবোধ জাগ্রত হয়। সংযম সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা ছোট বেলাতেই তারা পাবে মা-বাবার কাছে। আর সেটাই উত্তর জীবনে প্রতিফলিত হবে তাদের সমস্ত কাজে।

অনেক মা-বাবা আছেন, তাঁরা সদা সর্বদাই কর্তৃত্ব করতে চান তাঁদের শিশুর ওপর। প্রত্যেক কাজে শিশুকে এটা কর না, ওটা কর না প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এর ফলে শিশুর স্বাধীন সত্বাটি মোটেই জাগতে পায় না। ওরা ইচ্ছা শক্তিকে হারিয়ে একটি জবুথবু জীবে পরিণত হয়। হয়ে ওঠে লাজুক ও পরনির্ভরশীল। উত্তর জীবনে নিজের এই অক্ষমতা মা-বাবার প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলে। ছোট থেকে সন্তান বড় হচ্ছে। তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ জাগছে মনে। আবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে যোগ্যতা ও অযোগ্যতাও দেখা দিচ্ছে। এ কথাগুলি মা-বাবারা প্রায়ই ভুলে যান। নিজেদের ইচ্ছা মতো অনেক কিছু দাবী করেন শিশুটির কাছে —যা করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা হয়তো শিশুটির নেই। এই আস্থায় ব্যর্থ হলে শিশুটির মনে নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা জন্মায় ও অন্যান্য ভালো কাজে অলসতা ও শিথিলতা দেখা দেয়।

বেশির ভাগ মা-বাবাই শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের ধারণা শিশুকে প্রশ্রয় দিলে সে মাথায় উঠে নাচ্‌বে। এই কারণে সন্তানের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ দাঁড়ায় চাবুকের সম্পর্ক। এর

ফলে শিশু খুব চাপা প্রকৃতির হয় ও অনেক অন্যায় মা-বাবাকে লুকিয়ে করতে চেষ্টা করে। মা-বাবার কোনও কাজকেই শিশু পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না ও স্বভাবতঃই তাঁদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ পোষণ করে মনে মনে। এই সমস্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাদের মধ্যে অন্যের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণে ও কাজে।

অনেক সময়ই বিশেষ কোনও কারণের জন্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। তার ফলে স্বামী-স্ত্রীর কাছাকাছি আসা সম্ভব হয় না তখন তাঁরা কোনও একটি পুত্র অথবা কোনও একটি কন্যাকে পরস্পরের প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করেন। ফলে তারা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাম-জীবনের অবলম্বন সরূপ। এরা সন্তানের কাম প্রবৃত্তিকে নানাভাবে উত্তেজিত করে থাকেন। তাদের অতিরিক্ত চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গনে নিস্পেষিত হতে হয় ঐ সমস্ত হতভাগ্য সন্তানদের। মা-বাবার ঐ রকম অসংযত ও কামময় আচরণ শিশুর যৌবন ও জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে ও তাকে অস্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে থাকে। এর ফলে এরা উত্তর জীবনে অমানুষ হয়ে দেখা দেয়। আবার চরম আদর্শবাদী মা-বাবার সন্তানেরা কোন কালেই তার মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় না। তার ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে চরম দীন জনের মতো অসহায় ভাবে দিন কাটায়।

তাই মা-বাবাকে সন্তান মানুষ করার সময় এ কথাটা মনে রাখতেই হয়ে যে, কোনও কারণেই যাতে তার শিশুপুত্রটি অথবা শিশুকন্যাটি 'সমস্যা শিশু'তে পরিণত না হয়। তাঁদের মনে রাখতে হয়, মানুষ মাত্রই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে দেবত্বও আছে আবার পশুত্বও দেখা দিতে পারে ঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারলে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই ঈর্ষা, রোষ, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা ও যৌনজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়ার ইচ্ছা গোপনভাবে থাকে এবং সেগুলি সময় সময় তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করে। এ প্রবৃত্তিগুলিকে সাবধানে পথ দেখাতে না পারলে কষ্টের

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর মধ্যে পশু-প্রবৃত্তির প্রকাশ পেলে অকারণে মা-বাবা শিশুর প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠে শুধু তিরস্কার করবেন তা নয়। ধৈর্য ও সহনশীল মন নিয়েই তাদের এই খারাপ প্রকৃতিগুলিকে সুপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করবেন। শাসনে যে ফল হয় না—সেকথা ঠিক নয়। তবে তা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ভালোবেসে নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিলে তারা তা গ্রহণ করবেই। একটি কথা মনে রাখা দরকার 'শাসন করা তারই সাজে—সোহাগ করে যে গো'। আর মনে রাখবেন শিশুদের এই উপলব্ধিটি কিন্তু খুব বেশি তীক্ষ্ণ।

শিশু-পালনে মা-বাবার যেটা বিশেষ পালনীয় কর্তব্য সেটা হলো তাঁরা এমন কোনও কিছু করবেন না যা তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে। কোনও অসংলগ্নতা যেন কখনই দেখা না দেয় তাঁদের কাজের মধ্যে। এই ধরনের ব্যবহারই তার মনে বলিষ্ঠ বিবেক ও নীতি-বোধ জাগাতে সক্ষম হয়। দুর্লভ আদর্শের মোহ সৃষ্টি না করে শিশুকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যা থেকে সে বাস্তব সত্যগুলিকে গ্রহণ করতে পারে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষের গায়ের রং যেমন এক নয়, উচ্চতায় যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি প্রভেদ আছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে! আবার একই দেশের মানুষে মানুষে এই প্রভেদ আরও বেশি চোখে পড়ে। অতি বুদ্ধির মানুষের সঙ্গে তাই জড়-বুদ্ধির মানুষও দেখা যায়। এই জড়-বুদ্ধি মানুষ আবার দেখা যায় দু'রকমের। অনেকে জড়-বুদ্ধি হয়েই জন্মগ্রহণ করে। আবার অনেকে গুরুতর পীড়ার ফলে জড় বুদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে দ্বিতীয় ধরনের রোগটিকে অনেকসময় দূর করা সম্ভব হয়ে থাকে। জড়বুদ্ধি শিশুদের পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তাদের কণ্ঠনালীর কাছে অবস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি অপুষ্ট। শৈশবে ঐ গ্রন্থিগুলির চিকিৎসা করালে অনেক সময় জড়বুদ্ধি শিশু স্বাভাবিক বুদ্ধির শিশুতে পরিণত হয়। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য ও সহায়তায় জড়বুদ্ধির শিশুকে স্বাভাবিক শিশুতে পরিণত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

যে কোন সুস্থ ও বলিষ্ঠ পরিবারের শিশুকে সমস্যামূলক করে তোলার পক্ষে কুসঙ্গ একটি প্রধান সহায়। বাড়ির আশে পাশের দুষ্ট-প্রকৃতির লোকের সঙ্গ-দোষে শিশু প্রায়ই দুষ্ট-প্রকৃতির হয়। শিশুরা খুব অনুকরণ-প্রিয়। এই অনুকরণ প্রিয়তাই তাদের খারাপের দিকে নিয়ে যায়। বিদ্যালয় ও বাড়িতে যে সমস্ত শিশু কোণঠাসা অবস্থায় থাকে তারাই অন্যায় ও খারাপ কাজগুলিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে তাদের প্রতিহত আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত 'সমস্যা শিশু'কে মনোবিজ্ঞানীরা স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ভালো সঙ্গের মধ্যে বসবাস করে এরা স্বাভাবিক শিশুতে পরিণত হয়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানীরা—সাধারণত যে ঘটনাটি শিশুকে 'সমস্যা'য় পরিণত করেছে—সেটিকে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে তার সমাধানের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার বংশ বিবরণ প্রভৃতি এই সমস্যা নিরূপণে মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ কাজে আসে। তাই এরজন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। হুট্ করে শারীরিক চিকিৎসকের মতো একদিনে মনোবিজ্ঞানীরা কোনও প্রতিষেধক তালিকা তৈরী করে দিতে পারেন না। আর এই কারণেই 'সমস্যা শিশু'কে সংশোধনের জন্য চাই তার মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ও বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের গভীরতা এবং অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। আমাদের দেশে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে একদল কর্মী এগিয়ে এলেই দেশের অবহেলিত 'সমস্যা শিশু' স্বাভাবিক শিশুতে পরিণত হতে পারত। এমন দিন খুব নিকটে একথাটি আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে।

শিশুর সমাজ-চেতনা ও শিক্ষা

ভগবানের সৃষ্টির সবচাইতে আশ্চর্য সৃষ্টি হলো মানুষ। আর মানুষই হলো প্রাণী-জগতে সবচাইতে সমাজবদ্ধজীব। ওরা একসঙ্গে থাক্‌তে চল্‌তে ও বাস করতে ভালোবাসে। অবশ্য এই সমাজবদ্ধতা ঠেকে শিখেছে। আদিম যুগে যখন একা সে পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাস করত তখন সে ছিল প্রকৃতির দাস। বন্য জন্তুর হাতে নাজেহাল হতো প্রতিপদে। ক্রমে ক্রমে সে সভ্যতার পথে পা বাড়াল। হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখল। বন্য পশু শিকার করে ঝল্‌সে নিয়ে খেতে শিখল। তারও আগে শিখল দু'টি পাথর ঠুকে আগুনের ব্যবহার! সুষ্ঠু ও সভ্যজীবন-যাপনের জন্য দলবদ্ধ হতে শিখল। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে মানুষের সভ্যতার পথে এই যে দৃঢ় পদক্ষেপ তার মূলে প্রয়োজনের চাহিদা যেমন আছে—তেমনি রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তির সহজ প্রেরণাও। আর এর ফলেই আজ মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। উদ্দাম প্রকৃতিকে এনেছে তার হাতের মুঠোয়।

সহজাত প্রেরণাই মানুষকে ঘর বাঁধায় ব্রতী করেছে, করেছে পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে। যৌন প্রকৃতির তাড়না যখন মানুষ অনুভব করে তখনই বংশবৃদ্ধি করার জন্য স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হয়। এরপরে আসে স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষার তাগিদ। ফলে দেখা দেয় ঘর-বাঁধার প্রয়োজনীয়তা। আজও কিন্তু এই প্রভাবটি মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। যতদিন সে কৌমার্য ব্রত পালন করে

ততদিন অনুভব করে না তার স্থিতিশীল জীবনকে। তাই যাযাবর জীবনই তখন সে কামনা করে। বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে অনুভব করে 'একটি নিভৃত গৃহের কোণে একটি প্রদীপ শিখার মতো'। এইভাবে দু'টি মানুষের রচিত নিভৃত গৃহটি ক্রমেই ফুলেফলে ভরে ওঠে। নাতি-নাত্‌নী. ছেলেপুলেতে ভরে ওঠে সংসার। ক্রমে সৃষ্টি হয় পরিবারের। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে, আদান-প্রদান বিনিময়ের ফলে দেখা দেয় গোষ্ঠীর।

মানুষ যতই এগিয়ে চলে ততই তার কাছে জীবনধারণের প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এরজন্য একজনকে অন্যজনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে হয়। যারা পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী তারা শস্যের জন্য নির্ভর করে সমতলবাসীদের ওপর। আর পর্বতবাসীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় সমতলবাসীদের গৃহপালিত পশু প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য! বন্য পশুদের বশ মানিয়ে তারা পাঠায় সমতলবাসীদের কাছে, তবেই না সমতলবাসীরা গৃহপালিত পশু সংগ্রহ করতে পারে। এইরূপ সহযোগিতার ফলেই বন্যপশুরাও পোষ মানে—হয় মানুষের পদানত। এই যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার ফলে পর্বত আর সমতলে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এইভাবে গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের ফলে জাতির উদ্ভব হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন জাতির মিলনে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সমাজচেতনা।

মানুষ ক্রমেই শিল্প কাজে জড়িয়ে পড়তে থাকে, হয়ে ওঠে কর্ম-চঞ্চল। তার ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দেয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের কাজগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য! একই সমাজে কেউ পণ্ডিত হয়, কেউ হয় চিকিৎসক, কেউ মেথর হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মন দেয়, আবার কেউ হয় নাপিত, কেউ বণিক, আবার কেউ গ্রহণ করে দেশ রক্ষার দায়িত্ব। অবশ্য এর ফলে উৎকট শ্রেণীর বিভেদও কোথাও কোথাও দেখা দেয়। কিন্তু সবার উপর মানুষ গড়ে তোলে একটি ঝকঝকে স্বর্গরাজ্য।

অনেক দুঃখ-নির্যাতন মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে—নিজের গড়া সমাজব্যবস্থার কারণেই। তবুও তারা সমাজ ত্যাগ করতে পারেনি। নিজেদের প্রয়োজনে শুধু নিয়ম-কানুনের কিছুটা করেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এই সমাজ-চেতনা মানুষের মধ্যে শৈশব থেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ব্যক্তির জীবন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে—একটি সুগন্ধী ফুলের মতো সেই শৈশব থেকেই। মনোবিজ্ঞানীরা সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানুষের সমাজ চেতনার ক্রমোন্মেষের ধারাটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেই ধারা সম্বন্ধেই এখানে কিছুটা আলোচনা করব।

শিশু যখন মাত্র দু'মাস বয়সের তখন মানুষ দেখে আনন্দ প্রকাশ করে ও কাঁদে। অনেক মুখকে তার ভালো লাগে আবার কোনও মুখ তার মনে দুঃখ জাগায়। এই যে ভালো লাগা না লাগার অভিব্যক্তি শিশুর মধ্যে জাগে—একেই শিশুর মধ্যে সমাজচেতনার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে শিশু মানুষের মুখে ও কণ্ঠস্বরে যে মনোভাবের প্রকাশ পায় তা বুঝতে পারে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ও তীক্ষ্ণ চাহনিতে শিশু ভয় পায় ও কাঁদতে থাকে। মধুর স্বর ও স্নেহমাখা চাহনিতে সে আনন্দ প্রকাশ করে। এই সময়ে কোনও শিশুই কৃত্রিমতাকে ধরতে পারে না। তাই কৃত্রিম ক্রোধ বা রোষ প্রকাশ করলে তা সত্যি বলেই ধরে নেয়। আটমাস বয়স থেকে কৌতুক বুঝতে পারে এবং সমস্ত কৃত্রিমতা থেকেই রস সংগ্রহ করে থাকে।

অনেকে মনে করেন, শিশুর হাসির বা কান্নার সঙ্গে সমাজ চেতনার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। শুধু ক্ষিদে পেলেই শিশু কাঁদে ও আহার সম্পন্ন হলে আবার তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে—কথাটাও কিন্তু ঠিক নয়। পেট ভর্তি থাক্‌লে তার সামনে নানারকম ভঙ্গী করলে সে প্রাণ খুলে হাস্‌তে থাকে। 'মা' প্রায়ই শিশুর মন ভোলানোর জন্যে অঙ্গভঙ্গী করে থাকেন বলে সে

মায়ের কণ্ঠস্বর ও কথাবার্তা শুনলেই হেসে ওঠে। এর ফলে শিশু যে মায়ের সঙ্গ পছন্দ করে ও তা পেতে চায় সেটা খুব ভালো ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। তাই এটা সে সমাজচেতনার প্রথম পদক্ষেপ তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করবেন।

শিশুর জন্মের পরই মা-বাবা ও পরিবারের কোনও না কোনও বয়স্ক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে। তাঁরা সকলেই নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে শিশুটিকে আকৃষ্ট করে তোলেন। সে তখন একান্তভাবে তাঁদের সঙ্গই কামনা করে। তাঁদের দেখতে না পেলে কান্না জুড়ে দেয়। দূর থেকে তাঁদের দেখলে হেসে ওঠে। জীবনের প্রথম বছরে শিশুর সঙ্গী থাকে মাত্র একজন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে যদিও সে তিনটি সঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করে তবুও বন্ধুত্ব জমায় মাত্র একটির সঙ্গেই। এরপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-সাথীও বেড়ে চলে। ক্রমে ওরা বড় বড় দল গড়ে। দলের আবার একজন মধ্যমণি অর্থাৎ দলপতি থাকে। যে কোনও শিশুই দলপতি হতে পারে যদি তার মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলপতি হওয়ার প্রয়োজনীয় গুণগুলি প্রকাশ পায়। স্বাভাব দলপতি কখনই তার সঙ্গী-সাথীকে উৎপীড়িত করে না। উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে সে নিজেকে দলের মধ্যমণিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তার জন্য সে অন্য শিশুদের কাছ থেকে জোর করে নেতৃত্ব আদায়ের প্রয়োজন অনুভব করে না। আর কোনও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু কাছে এগিয়ে এলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না বরং কাকে কী করতে হবে, কী ভাবে কাজ করলে দলের উন্নতি হবে—তা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় ও সেই ব্যক্তিত্বকেও নিজের দলের মধ্যে গ্রহণ করে থাকে। মধুর ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনী শক্তিই হলো দলপতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—এটা সে তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অনেক শিশু এক সঙ্গে মিলিত হয়

সেখানে প্রথম প্রথম তাদের কোনও দল থাকে না। আস্তে আস্তে মেলামেশার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে দলপতির সৃষ্টি হয় ও সমগ্র দলটি একটি পরিবারে পরিণত হয়। দলপতিকে সমস্ত সময়ই দলটি কী চায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এই ভাবে বিদ্যালয়ে মেলামেশার মধ্য দিয়ে, খেলার মাঠে খেলার মধ্য দিয়ে, এমন কী তেঁতুল তলায় তেঁতুল কুড়োনোর মধ্য দিয়েও শিশুদের নিজস্ব দল গড়ে উঠতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী শিশুরা আবার ভিন্ন দল তৈরী করে। এইভাবে শৈশবে তারা দল গড়ার মধ্য দিয়েও সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহ ও মনের হঠাৎ পরিবর্তনের সময় তরুণ-তরুণীরা মাত্র কিছুদিনের জন্য সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা তরুণ-তরুণীদের এই স্বভাবেরই অনুসন্ধান করে বলেছেন যে এটামাত্র তরুণদের বেলায় থাকে কয়েক মাস আর তরুণীদের ক্ষেত্রে এই স্বভাব থাকে দু' মাস থেকে ছ' মাস পর্যন্ত। প্রথম ঋতু স্রাবের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীদের এই ভাব দূর হয় ও তারা সমাজের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঐ বিদ্রোহ ভাব চলার সময় তারা মাত্র একজনের সঙ্গেই ভাব জমায়। এই বন্ধুত্ব প্রায় চলে সারা জীবন ধরে। এই বন্ধুত্বকেই চল্‌তি ভাষায় আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে 'মানিক জোড়' বলে। অনেক সময় ঐ সময়টিতে তারা কোনও বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও সেটাই জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করে থাকে।

শিশুর মানসিক গঠনের ধারা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপর। একটি হলো তার বংশানুক্রম ও অন্যটি হলো তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তার মা-বাবা অথবা যাদের কাছে সে বড় হয়ে উঠছে তারা যদি নির্জনতাপ্রিয় হন, তবে শিশু নির্জন প্রিয় হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। কিংবা বহুজনের সংস্পর্শে আসার যদি কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকে—তবে ও নির্জনতাপ্রিয়-আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।

শৈশবের অহংবোধ যদি যৌবনে স্বাতন্ত্র্যবোধে পরিণত হয় তবে সে কখনই অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। ফলে সে সমাজ থেকে বাইরে চলে যাবে। অনেক সময় এই কারণগুলির জন্য শিশুর মধ্যে সমাজচেতনা ব্যাহত হয়ে থাকে। মনীষী এড্‌লার মনে করেন যে শিশুর মধ্যে সমাজচেতনার সঞ্চার বহুল পরিমাণে পরিবারের সাহায্যে হয়ে থাকে। নিজের বড় ছেলেটিকে মা-বাবা দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তার ফলে সে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় ও তার মধ্যে সমাজচেতনার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। অপর দিকে ছোট্ট ছেলেটি মা-বাবার ও পরিবারের নয়নের মণি রূপে দেখা দেয়। ফলে সে সমাজকে দেখতে ও জানতে শেখে না। সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। উত্তরজীবনে পরনির্ভরশীলতাই তার জীবনকে বিষময় করে তোলে।

শিশু আস্তে আস্তে কী ভাবে সামাজিক হয়ে উঠছে তা লক্ষ্য করা সম্ভব হয় যদি শিশুর প্রাত্যহিক ব্যবহারের একটি বিবরণ রাখা যায়। শিশু জন্মের পর অন্যের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাকুক নিজের কোনও স্বতন্ত্র সত্বার উপলব্ধি করতে পারে না। বড় হয়ে আস্তে আস্তে সে দু'একজন করে অনেকের সঙ্গেই মিশতে শেখে। ক্রমে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে থাকে অনেকের সঙ্গেই। ক্রমে ভাবতে শেখে সমাজের কথা। একাত্মতা ও আকর্ষণ-অনুভব করে সমাজের প্রতিটি লোকের প্রতি। এইভাবে সমাজে জড়িয়ে পড়ে হয়ে ওঠে একান্ত ভাবেই সামাজিক জীব।

অধুনা আমরা শহরে বাস করে সমাজকে শিখেছি অবহেলা করতে —তাই আমাদের সমাজ আজ ভাঙ্গনের মুখে। শিশু আজ তাই আর বৃহৎ পরিবারভুক্ত নয়। একলাটি নির্জনে মা-বাবার কাছে মানুষ। তাই কেবল মা-বাবার মুখাপেক্ষি হয়ে গড়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক রূপে। মানব চরিত্রের প্রধান গুণ দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসাকে ভুলে গড়ে ওঠে বীভৎস কদর্যতার মধ্যে। তাই আর তার মধ্যে স্বতঃ উৎসারিত করুণা ও মমতার ফল্গুধারা বয়ে চলে না। সিক্ত করে না

রূঢ় ও কঠোর মানুষের মনকে। যে আবেষ্টনীর মধ্যে থাকলে শিশু ক্রমেই সামাজিক হয়ে ওঠে সে আবেষ্টনীর সন্ধান পাওয়া যায় না কোথাও। তাই বড় হলে সে হয়ে ওঠে অসামাজিক। এ ছাড়া সৎপুত্র বা কন্যা, পালিত সন্তান, মা-বাবা হারা অনাথ ছেলে-মেয়েদের সুষ্ঠু সমাজ-চেতনা কখনই বিকাশ লাভ করতে পারে না। ঘরে বাইরে তারা অবহেলিত হয় তার ফলে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা মানুষ হয় সেগুলি সমস্তই সমাজচেতনার প্রতিকূলে। তারা সমস্ত সময়ই নিজেদের ছোট বলে ভাবে ও অন্যের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে চায়। এর ফলে ওরা হয়ে ওঠে পুরোপুরি অসামাজিক। উত্তর জীবনে এদের কাছ থেকে সমাজ প্রচণ্ড আঘাত পায়। অনেক সমাজ বিরোধী কার্য কলাপ এদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

তাই শিশু জন্মের পর থেকেই স্বাভাবিক উপায়ে সে যে সামাজিক জীব এই বোধটি তার মধ্যে এনে দিতে হয়। পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ হলে স্বাভাবিক উপায়েই সামাজিক হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিবার থেকে দূরে মানুষ প্রতিটি শিশুর মা-বাবা যদি এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেন তবে প্রত্যেকটি শিশুই ভাবীকালে সামাজিক হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে সমাজের কর্ণধার। আর অসহায় শিশুদের দায়-দায়িত্ব হলো সরকারের উপর তাঁদের চেষ্টার ফলেই অবহেলিত জীবনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তারা দেশকে ভালোবাসতে শিখবে। সঙ্গে সঙ্গে শিখবে যে সমাজে সে বাস করছে তাকে ভালোবাসতে। আর সমাজের মনে রাখতে হবে যে তারা অনাথ শিশু হলেও সমাজের বাইরে নয়। তারাও সমাজেরই একজন তাই সমাজ তাদের ও নিজের আপনার জন বলে গ্রহণ করবে। সমাজের প্রতিটি লোকের স্নেহ-সিঞ্চনে অনাথ শিশুরা আর নিজেদের অনাথ বলে ভাববে না। তারাও মানুষ হয়ে সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। করে তুলবে সমাজকে বড়। আজকের দিনে প্রতিটি দায়িত্বসম্পন্ন লোককে এগিয়ে আসতে হবে এবং তুলে ধরতে হবে ভাঙ্গনমুখ সমাজকে—গড়ে তুলতে হবে সমাজকে আবার নতুন করে।

শিশু-বিদ্যালয় ও নাস ারী স্কুল

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের যে ছোট্ট শিশুটি তার মা-বাবার স্নেহছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে বড় হয়ে উঠ্ছে, সে-ই একদিন জাতির ভাগ্য-বিধাতা রূপে দেখা দেবে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—'যে হাত শিশুর দোলনা-দোলায়—তা-ই একদিন রাজ্যশাসন করে।' তাই জীবনে মায়ের প্রভাব—তার অন্যান্য আত্মীয়দের প্রভাবের চাইতে অনেক বেশী। জননীই হলেন শিশুর প্রকৃত শিক্ষাদাত্রী। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক ত্রুটিই আমাদের চোখে পড়ে। একে তো আমাদের গৃহের জননীরা শিশুশিক্ষার বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোটেই অভ্যস্ত নন। এর উপর অনেক প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাঁরা শিশুর দিকে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগও দিতে পারেন না। এ সমস্ত কারণেই শিশু—বিদ্যালয়কে শিশুশিক্ষা এবং পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান কেন্দ্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

শিশুশিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করে আসছেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) প্রথম শিশু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। রবার্ট ওয়েন শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বিকাশগুলোর চিন্তা করে নিয়েই তাঁর বিদ্যালয়টিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রূপ দেন। এর পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জেমস্ মিল (James Mill) ও হেনরি ব্রোগহাম্ (Henry Brougham) ওয়েস্ট মিনিস্টারে একটি শিশু বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেন। এই ভাবে

ইংল্যাণ্ডে শিশু-বিদ্যালয়গুলি আস্তে আস্তে জাতির প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে থাকে! এরপর ক্রমে ক্রমে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশেও শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখা দেয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য শিশু-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। রুশো (Rousseau) এবং পেস্টালজি (Pestalzzi)-র শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করেই ফ্রোবেল (Frobel) তাঁর কিণ্ডার-গার্টেন (Kinder-garten) পদ্ধতির কথা সকলকে জানান এবং তা জার্মানীর ব্লেকেনবার্গে প্রতিষ্ঠিত শিশু বিদ্যালয়টিতে প্রথম রূপ নেয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিশু বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্যাপকভাবে শিশু বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মন্তেসরী রোমে শিশুনিকেতন (Children's House)-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন দেশে শিশু-শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিশুকে তখন পর্যায়ক্রমে গুরুগৃহে অধ্যয়নের জন্য দিন কাটাতে হতো এবং সেখানেই সে পেতো তার আচার-ব্যবহারও নীতিজ্ঞানের শিক্ষা। এর পরেই আস্তে আস্তে পাঠশালাগুলি আমাদের শিশু-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। পরের যুগে বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের দেশে যে অরাজকতার ঢেউ লাগল—তার ফলে শিশু-শিক্ষায়ও দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। পাঠশালাগুলো শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের বদলে হয়ে দাঁড়াল অশিক্ষার গোয়ালরূপে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশেও শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু কিণ্ডার-গার্টেন, নার্সারী কিংবা মন্তেসরী প্রণালীকে ভিত্তি করে যথেষ্ট পরিমাণে শিশু-বিদ্যালয় এখনও আমাদের দেশে গড়ে উঠছে না। আর যে সামান্য দু-একটি শিশু-বিদ্যালয় বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গড়ে উঠছে—তার পড়ার ব্যয় বহন করা আমাদের দেশের অভিভাবকদের

পক্ষে মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই তো বলি—পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে যদি আমাদের দেশেও অবৈতনিক নার্সারী স্কুল গড়ে ওঠে—তবেই সত্যিকারে জাতির কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এই ব্যাপারে জাতীয় সরকারকে অগ্রসর হতে হবে।

আজকের দিনে শিশু মনোবিজ্ঞানের সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে ঃ Do not yield, but do not punish অর্থাৎ ছেলের কাছে হারও মানবে না আবার তাকে শাস্তিও দেবে না। কিন্তু হাজার শিক্ষিতা হয়েও আমাদের দেশের ক'টি 'মা' এই কথাটিকে অনুসরণ করতে পারছেন? শিশুর অন্যায় জেদের কাছে নতি স্বীকার না করে—তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না দেখিয়ে পদে পদে এতখানি ধৈর্য দেখানো দৈনন্দিন জীবনে সত্যিই কি সম্ভব? এর জন্যেই শিশুকে যথাযোগ্য উপায়ে গড়ে তুলতে হলে চাই সুন্দর পরিপার্শ্বিক আর সুষ্ঠু আবেষ্টনীর। এই ধরনের পরিবেশ স্কুলে পাওয়াই সম্ভব।

প্রথম বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে শিশু এক নতুন জীবনে প্রবেশ করে। সে ঐ সময় হাঁটতে শেখে এবং কথাও বলতে পারে। জীবনটা তার কাছে দিনের পর দিন নতুন থেকে নতুনতর হয়ে দেখা দেয়। এই সময় শিশুর শারীরিক এবং মানসিক শক্তিগুলির বিকাশের জন্য খেলাধুলো ও দৌড়-ঝাঁপের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়িতে তা মোটেই সম্ভব নয়। এই কারণে নার্সারী স্কুলে চলে শিশুর জীবনকে নতুন করে গড়ার প্রয়াস। তাই প্রত্যেকটি নার্সারী স্কুলের সঙ্গে চাই প্রশস্ত খেলার মাঠ, বাগান এবং খেলাধুলোর আধুনিকতম সরঞ্জাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—The battle of Waterloo was won on the play field of Eton অর্থাৎ ইটনের খেলার মাঠেই ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয়ের সূচনা দেখা দিয়েছিল।

একদিন হ্যারোর প্রখ্যাত পাবলিক স্কুলের হেড মাস্টার ডঃ নরউডের সঙ্গে দেখা করতে এলেন—জাপানের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার। তিনি কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন ও-দেশের সাফল্যমণ্ডিত শিক্ষা-



শিশুর খেলাধুলো

ফটো ঃ শ্রীসুনীলকৃষ্ণ ঘোষ

পদ্ধতি সম্বন্ধে। নরউড মন দিয়ে তাঁর কথা শুনে—ঘরের জানালা ফাঁক করে তাঁকে ঘরের বাইরে দেখালেন বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। সেখানে ছেলের দল মনের আনন্দে খেলা করে চলছে। সঙ্গে আছেন একজন শিক্ষক। তিনিই ছেলের দলের খেলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। নরউড বল্লেন—'চেয়ে দেখুন—ওখানেই আমাদের সাফল্যের বীজ লুকোনো আছে। এই মাঠের মাঝেই গড়ে ওঠে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ।'

স্বাস্থ্যের দিক থেকেও দেখা গেছে—শৈশব থেকে যারা নার্সারী স্কুলে যাবার সুবিধে পায়—তাদের স্বাস্থ্য সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী সুস্থ এবং সবল হয়ে গড়ে ওঠে। আদব-কায়দা, সামাজিকতা এবং নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকেও যে তারা অন্যান্য শিশুদের চাইতে সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে ওঠে—তার প্রমাণ বিদেশের শিশু বিদ্যালয়গুলির বিবরণ থেকেই জানতে পারা যায়।

আমাদের বাঙ্‌লা দেশেও অনেকগুলি নার্সারী স্কুল গড়ে উঠেছে—আর মধ্যে কয়েকটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে।

শিশু বিদ্যালয় অথবা নার্সারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় যে ক'টি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন তা হলো :

(১) স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে শিশু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

(২) চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শিশুদের শারীরিক পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখা।

(৩) শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

(৪) খেলাধুলো এবং কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর কল্পনা শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে—তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

(৫) একসঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শিশুদের গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করে—তাদের এক একটি সুস্থ নাগরিকে পরিণত করা।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগোপযুগী বিপ্লব ঘটেছে বলা যেতে পারে। ভারতের মহান্ নেতারা শিক্ষা বিষয়ে অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার উপরই সব চাইতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের। শুধু গণতান্ত্রিক দেশ বলা অন্যায় হবে—ভবিষ্যৎ ভারত এক শিল্প সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে চলেছে। পরীক্ষা আর নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। তাই গুণাগুণ বিচারে ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি ঠিক পথ নিয়েছে কিনা সে কথা বলার এখনও সময় আসেনি।

বর্তমান ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছে। তবে স্বাভাবিক উপায়েই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে দেশের মানুষের ভাবধারা, চরিত্র ও দেশের মাটিকে ভিত্তি করেই—একথা আজ নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

গত সতের বছরের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ছবি এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা কথাটির দু'টি অর্থ করা যেতে পারে। সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যালয়কে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় বলা যেতে পারে। সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যে অবশ্য একই প্রথা বিদ্যমান নয়। উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে বিদ্যালয়

তাকে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় বলেই ধরা হয়। এখানে ছয় বছর বয়স থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভ করে থাকে। মহারাষ্ট্রে কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় পড়ে।

তাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মধ্যে পড়ল (১) ছয় থেকে এগার বছর বয়স অর্থাৎ প্রথম বয়সের শিক্ষা, আর (২) এগার থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা। এই দুই ধরনের বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া যেতে পারে নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক অথবা মধ্য বিদ্যালয় বা নিম্ন মাধ্যমিক।

জাতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বলতে জাতির প্রথম স্তরের শিক্ষাকেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের শিক্ষাকেই অবৈতনিক এবং আবশ্যিক করার কথা।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবশ্যিক করার আন্দোলন বা প্রশ্ন আজকের নূতন নয়। ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম এ্যাডামের কথাতেই এর আভাস পাওয়া গিয়েছিল. তিনি বলেছিলেন ঃ 'প্রত্যেক গ্রামকে বাধ্য করতে হবে বিদ্যালয় পরিচালনা করবার জন্য'।

১৮৫২ সালে বোম্বাই রাজ্যের রেভিন্যু সার্ভে কমিশনার ক্যাপ্টেন উইঙ্গেট কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ও সাধারণের আবশ্যিক শিক্ষার জন্য শতকরা ৫৲ (পাঁচ) টাকা শিক্ষাকর বসাবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে ভরুচের সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীশাস্ত্রী প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

জাতীয় জীবনে অনেক মনীষী উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন সর্ব সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য। তবে তাঁরা সবাই প্রায় গণশিক্ষার কথা বলেছেন। গণ শিক্ষাই হোক্ আর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই হোক্—আসল কথা দেশের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করা।

বোম্বাই প্রদেশ এ ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের পথ প্রদর্শক বলা

যেতে পারে। শীতলবাদের চেষ্টায় ওখানেই সরকার ১৯০৬ সালে এই শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কমিটি নিযুক্ত করেন। এদিকে বরোদার গাইকোয়াড় তাঁর আম্রেলি তালুকে ১৮৯৩ সালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করলেন। ১৯০৬ সালে সমস্ত রাজ্যেই এই ব্যবস্থা চালু হল।

১৯১০ সালে গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচারে এই বিষয়ে প্রস্তাব আনলেন। গোখেলের প্রস্তাব খুব অসম্ভব কল্পনার নয়। তিনি ছয় বছর থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ৩৮-১৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। এই প্রস্তাব যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন।

গোখেল হেরে গেলেন। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে এসে শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিলেন। তার ফলে ১৯০৪ এর শিক্ষা আইন পরিবর্তন করে ১৯১৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। নূতন সিদ্ধান্তের প্রধান ধারাগুলিতে বলা হল যে—

(১) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়ানো হবে।

(২) যুগপৎ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে। প্রয়োজন বোধে নিম্ন প্রাথমিককে উচ্চ প্রাথমিকে পরিবর্তিত করা যাবে।

(৩) ছাত্রদের সামাজিক শ্রেণী থেকেই শিক্ষক নেওয়া হবে।

(৪) পঞ্চাশ জনের বেশি একটি শিক্ষকের অধীনে ছাত্র থাকতে পারবে না।

১৯১৭ সাল থেকে বাংলা দেশে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় স্কুল করা হল। অর্থাৎ ১৪ বর্গ মাইলের মধ্যে একটি 'ইউনিয়ন' তার অধীনে একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখতে পারবে সরকারী খরচায়। তিনটি শ্রেণী এতে। এ ব্যবস্থা নানা কারণে সফল হল না।

এর পর ১৯১৯ সালে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু হল। মিউনিসিপ্যালিটির উপর এই শিক্ষার ভার দেওয়া হল। এই শিক্ষা অবৈতনিক হল না বটে, তবে অপারগ অভিভাবকদের বেতন মকুব করার ক্ষমতা থাকল মিউনিসিপ্যালিটির উপর।

তারপর অব্যাহত গতিতে প্রস্তবাদি চল্‌ল। ১৯৩৪ সালে প্রস্তাব হল প্রাথমিক শিক্ষা চার শ্রেণী পর্যন্ত হবে। গরীবদের বেতন নেওয়া হবে না। বাংলা দেশকে ১৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় অঞ্চলে ভাগ করা হবে। তাতে ৬৪,০০০ জন শিক্ষক থাকবেন। ছেলেদের মাইনে কত হবে, শিক্ষকেরা কত বেতন পাবেন, ক'জন ছেলে নিয়ে একটি শ্রেণী তৈরী হবে—ইত্যাদিরও বিধান থাকল।

স্বাধীনতার পর সংগঠন বিধির উপরোক্ত ধারাকে অনুসরণ করে স্বাধীন ভারত কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থা এবং রাজ্য উভয়ের মিলিত সহযোগে এই কাজ রূপায়িত করতে চেষ্টা করছেন। দুটি ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—(১) চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং (২) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত অবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং এই শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষায় পরিবর্তিত করা।

১৯৫৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থার নিরীক্ষা করে (Educational Survey) দু'টি নীতি নির্ধারণ করা হল—(ক) প্রতি ৩০০ বা অধিক অধিবাসীর জন্য একটি করে স্বয়ং নির্ভরশীল (Independent) প্রাথমিক বিদ্যালয়। (খ) যেখানে অধিবাসীর সংখ্যা ৩০০ জনের কম সেখানে কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসী একত্র করে উপরোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী বিদ্যালয় নির্মাণ। এই বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হল (Group) গোষ্ঠী বিদ্যালয়। নিরীক্ষায় দেখা গেছে সারা ভারতে এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে—৩,২৩,৪৬৩টি। তার মধ্যে ১,৫০,২১৫টি স্বয়ং নির্ভর ও ১,৭৩,২৪৮টি গোষ্ঠীগত। এই বিদ্যালয় ২৭·৭৫ কোটি লোকের শিক্ষার সুযোগ দিতে পারবে।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের দিকে নির্ধারিত অঞ্চলে ২,২৭,১৩৫টি বিদ্যালয় ছিল। বাড়তি বিদ্যালয়ের সংখ্যা হিসেবে আরও ৯৮, ৩২৮ টির প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্বে কিছু বিদ্যালয় এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির মতে পশ্চিম বঙ্গে আনুমানিক ২৭৭৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাতে ছাত্রদের সংখ্যা হল ২৮ লক্ষের মতো। শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার। অর্থ বরাদ্দ হল ৬.৩৭ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে ৩৪ লক্ষে পৌঁচেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজারের মতো।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

কিশোরকালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। প্রবেশিক পরীক্ষার বয়সের সীমা কখনও ছিল আবার কখনও তুলে দেওয়া হয়েছিল। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পৃথক এক ধরনের বিদ্যালয় ছিল যাকে বলা যায়—মধ্য বিদ্যালয় (Middle School)।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার কালকে আট বছরের ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। পুথি-পুস্তকে এই উপরোক্ত জিনিসটি মেনে নিলেও বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়—ছয় বছর থেকে এগার বছর হল প্রাথমিক শিক্ষার কাল। বারো বছর থেকে ষোল বছর হল উচ্চ বিদ্যালয়ের কাল। আর বারো বছর থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত কালটি হল—উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাল। প্রকৃত পক্ষে পূর্বেকার দশম শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীতে তুলে আনায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাম পেল। এদিকে একাদশ শ্রেণী হওয়ায় কলেজের চার বছরের স্নাতক পড়ার কাল কমে গিয়ে হল তিন বছর।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবার আর এক ধরনের বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘট্‌ল। তাকে নামাকরণ করা হল বহুমুখী বিদ্যালয় রূপে। বহুমুখী বিদ্যালয়ে সাত রকমের পাঠ্যতালিকা থাকে—যেমনঃ (১) মনন-বিদ্যা, (২) বিজ্ঞান, (৩) শিল্প-বিজ্ঞান, (৪) ব্যবসা-বিজ্ঞান (৫) কৃষি-বিজ্ঞান, (৬) অঙ্কন-বিদ্যা, (৭) গাহ'স্থ-বিজ্ঞান, দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর সমগ্র দেশে ৩,১২১টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২,১১৫ টি বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে ওগুলিকেই সংগঠিত করা হবে।

সমাজ শিক্ষা ঃ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যেই বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ইংরেজ আমলেও আমাদের দেশে ছিল। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেল, শতকরা মাত্র ১৬·৬ জন শিক্ষিত আমাদের দেশে। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হল শতকরা ২৩·৭ জন। বর্তমানে গড়ে ৫০,০০০ জন বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বার্ষিক ব্যয় ৮০ লক্ষ টাকা। এই বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন নামকরণ হল সমাজ শিক্ষা। এখন শুধু বয়স্কদের শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ এই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজে নতুন নতুন দিক থেকে বয়স্কদের পরিচিত করিয়ে দেওয়াও এই সমাজ শিক্ষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের প্রতি-নিধিদের শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকার পরিচালিত জনতা কলেজ স্থাপিত হয়েছে অনেক জায়গায়। সমাজ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে নীচের কাজ গুলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছেঃ (১) পুস্তিকা প্রকাশন বিভাগ, (২) অভিনব পুস্তকের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা, (৩) যাঁরা শেখাবেন তাঁদের জন্য সাহিত্য রচনা বিভাগ, (৪) ইউনেস্কোর পরিচালিত নতুন বয়স্ক শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য, (৫) উপযুক্ত কোষ গ্রন্থ প্রকাশনা।

বুনিয়াদি শিক্ষা ঃ

১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধী উদ্ভাবিত বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষার বদলে কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই হল বুনিয়াদি শিক্ষার বর্তমান নীতি। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৫০ সালে কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম প্রচলন হয়। সেই নীতিই বর্তমান ভারতের সর্বত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে এবং নিম্নবুনিয়াদিকে উচ্চ বুনিয়াদিতে উন্নত করতে অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। জি, রামচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি পরীক্ষামূলক কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত 'কম্প্যাক্ট এরিয়া মেথড'কে নাকচ করে দিলেন। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৫৬ সালে মন্ত্রী পরিষদ National Institute of Basic Education নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ১৯৬০-৬১ সালে ১৪৯০ টি, ছাত্র সংখ্যা ১,৫৬০০০ হাজার। এই যদি ১৯৬০-৬১ সালের অবস্থা হয় তবে যতই এর প্রসার ঘটুক, সম্পূর্ণ সফল হতে বুনিয়াদি শিক্ষার এখনও অনেক সময়ের প্রয়োজন।

শিক্ষক শিক্ষণ ঃ

বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতি কল্পে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের শিক্ষণের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মানসিকতা অনুসরণ করে বিষয় বস্তু উত্থাপন না করতে পারলে পড়ানোর কাজ সুষ্ঠু হয় না। এর জন্য আবার শিশু মনস্তত্ত্বেও শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সম্যক জ্ঞান থাকার বিশেষ প্রয়োজন। উপরোক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই দু'রকমের শিক্ষক শিক্ষণ

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছেঃ (ক) প্রাথমিক শিক্ষকদের এবং (খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য।

পশ্চিম বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ৭০টি প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে ৪৮৪০ জন শিক্ষকের পড়বার ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে পাঁচটি বুনিয়াদি ও বারোটি সাধারণ।

ফল লাভ ঃ

(ক) সমগ্র ৬-১১ বছরের বালক-বালিকা—শতকরা হারে শিক্ষা নিয়েছে···২৬˙৭ জন

(খ) সমগ্র ১১-১৪ বছরের বালক-বালিকা—শতকরা হারে শিক্ষা নিয়েছে···২২˙৫ জন।

(গ) সমগ্র ১৪-১৭ বছরের বালক-বালিকা—শতকরা হারে শিক্ষা নিয়েছে···১১˙৭ জন।

কোঠারী কমিশন ঃ

রাধাকৃষ্ণ কমিশনের এক্তিয়ার ছিল—'বিশ্ববিদ্যালয়'। মুদালিয়র কমিশনের ছিল—'মাধ্যমিক শিক্ষা'। ডঃ দৌলত সিং কোঠারীর এলাকা নির্ধারিত হয়েছে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা। এটা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের সার্থকতার আশায় আমরা উৎসুক রইলাম।

গ্রন্থপঞ্জী

১। A Hand Book of Child Psychology—Edited by Carl Murchison.

২। Psychology—By Roberts Woodworth and Donald. G. Marquis.

৩। Educational Psychology—By Peter Sandiford.

৪। In Yonr Hands—Edited by—The Book House for Children.

৫। The Discovery of the Child—By Maria Montessori.

৬। How shall I tell my Child—By Belle. S. Mooney.

৭। Child Care—By Josepheni Hemenway Kenyon and Ruth Kenyon Russell.

৮। Having a baby—By Alan Frank Guttmacher.

৯। Baby and Child Care—By Benjamin Spock.

১০। Advice to the expected Mother—By F. J. Browne.

১১। শিশুর শিক্ষা—শামসুন নাহার।

১২। শিশু মন—শ্রীরমেশ দাশ।

১৩। কিশোর ও কৈশোর—শ্রীনির্মল চৌধুরী।

১৪। ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা—অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায়।

১৫। Child Psychology—Arthur. T. Jersild.

১৬। The First two years—Mary M. Shirley.

১৭। The Art of Teaching—Gilbert Highet.
